আনন্দমেলা

৪ এপ্রিল ১৯৮৪
২·৫০
আনন্দবাজার-প্রকাশন

এই সংখ্যায়

সুব্রত নিয়োগীর

সম্পূর্ণ উপন্যাস

বকখালিতে বিপদ

ধু লো খে লা
অতীতের সাগর সেঁচে মণি মানিক্যের সন্ধান
Please visit : http://dhulokhela.blogspot.in/
পড়ুন ও আমাদের
সংরক্ষণে সাহায্য করুন

নতুন ভোর হল নতুন রোদ উঠল
নতুন সানলাইট
ডিটারজেন্ট পাউডার
আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক
আপনিও আপনার ঘরে সানলাইটের ঝলমলানি আমুন। নতুন সানলাইট ডিটারজেন্ট পাউডার ওজনে খুব হাল্কা. কিন্তু কাজ দেয় বেশি। দামী পাউডারের মত কাজ দেয়, অথচ দাম কম।
সানলাইটে একটি এমন উপাদান আছে, যা সাধারণ পাউডারে নেই। এটি কাপড়ের প্রতিটি তন্তু থেকে ময়লা বের করে দিয়ে তাতে চমক নিয়ে আসে।
সানলাইটে না হয় হাতের কষ্ট, না হয় কাপড়ের ক্ষতি। আর এর তাজা মনোরম সুগন্ধ আপনার কাপড়ের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়বে।
আপনিও আপনার জীবনে নিয়ে আসুন সানলাইটের চমক। একবার ব্যবহার করে দেখুন—মাত্র ৬ টাকা ৩৫ পয়সায়।
মাত্র
টা.৬·৩৫
(স্থানীয় কর অতিরিক্ত)
Double Power
SUNLIGHT
DETERGENT
POWDER
For a brighter wash
আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক
হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন
OBM/2568 BEN

আনন্দমেলা

সম্পূর্ণ উপন্যাস

বকখালিতে বিপদ ৫০
সুব্রত নিয়োগী

ইতিহাসের গল্প

লাটসাহেবের বাড়ি হল ৩২
প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

গল্প

অন্ধকারে রাতবিরেতে ৬
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

টাসকেন ১৪
মুক্তিনাথ গুপ্ত

ডাক ২৫
আলোক সরকার

'গোরুমারা' ফরেস্ট ৪৬
অমরনাথ দে

ছড়া

দুটি ছড়া ৩১
অজিতকৃষ্ণ বসু

ধারাবাহিক উপন্যাস

কালো পর্দার ওদিকে ২১
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

স্মৃতিকথা

ব্যাট-বলে ৪৪
পঙ্কজ রায়

লেখাপড়া

বিধাননগর সরকারি স্কুল ২৯
বাংলা বলো ৯২
সহজে ইংরেজি ৯৩

খেলাধুলো

পাকিস্তানে ইংল্যাণ্ডের পরাজয় ৮৩
পাকিস্তানের অনিল ৮৪
ক্যাচ ধরার রেকর্ড ৮৫
'গালি'তে কে ৮৭
এশীয় ক্রিকেট কাপ ৮৮

কমিক্‌স, ধাঁধা-মজা; শব্দসন্ধান

তোমাদের পাতা

প্রচ্ছদ : সুকুমার রায়

চৈত্র নেবেন বিদায়, দুয়ারে
দাঁড়িয়ে আছেন বৈশাখ ;
ঝোড়ো হাওয়া তাঁরই হুঙ্কার ছাড়ে,
কোথায় মাল্য, কই শাঁখ ?
আমরা তো ভাই মালা গেঁথে যাই,
কিন্তু তিনি যে বিশ্ব
জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে করবেন ছাই,
অগ্নিলোচন গ্রীষ্ম !

২১ চৈত্র ১৩৯০ ৪ এপ্রিল ১৯৮৪ ৯ বর্ষ ২৬ সংখ্যা

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড, কলকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত। দাম দু'টাকা পঞ্চাশ পয়সা। বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

শুধুমাত্র জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডার-ই তার নিজস্ব অনন্য ৩-মুখী ক্রিয়া দ্বারা ঘামাচি হওয়া রোধ করে ও তার মোকাবিলা করে

OBM-2516/BN

কেবলমাত্র জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডারে আছে এক প্রমাণিত ঔষধিযুক্ত ফর্মুলা, যেটি ৩টি কার্য্যকরী উপায়ে কাজ করে:

- **রোধ**
  এর ব্যাকটিরিওস্ট্যাটিক ক্রিয়া ক্ষতিকর ব্যাকটিরিয়ার প্রসারকে রোধ করে।
- **আরাম**
  মনোরম সুবাসভরা জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডার আর্দ্রতা শুষে নেয় আর তাড়াতাড়ি আরাম দেয়।
- **ক্রিয়া**
  জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডারের এক অনন্য কেরাটোলিটিক ক্রিয়া ঘামাচিতে আক্রান্ত ত্বককে তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করে দেয়।

সারা পরিবারের সুরক্ষা

Johnson & Johnson

জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডার, ঘামাচির হাত থেকে আপনার সর্বোত্তম সুরক্ষা

বিজ্ঞানবিচিত্রা

চঞ্চল পাল

বিস্ময়-ব্যাঙ

ভেনেজুয়েলার জলা-জমিতে নানা ধরনের ব্যাঙ যেমন ঘুরে বেড়ায়, তেমনি ঘুরে বেড়ায় ব্যাঙ-শিকারি নানা প্রাণী। এখানে এমন একটা প্রজাতির ব্যাঙের সন্ধান পাওয়া গেছে যার স্বভাব ও চেহারা প্রাণীবিজ্ঞানীদের কল্পনাকে হার মানিয়েছে।

আমরা যেসব ব্যাঙ দেখি তাদের পেছনদিকটা মোটা ; কিন্তু এই ব্যাঙগুলোর চেহারা গলা থেকে পেট পর্যন্ত লম্বাটে, অবশ্য মাথা ও পাগুলো আমাদের দেখা ব্যাঙের মতোই দেখতে। শুধু তাই নয়, এরা অলিম্পিকের লংজাম্পে নাম দিলে মানুষের মাথা হেঁট হয়ে যাবে। কারণ, ভয় পেলে এদের এক-একটা লাফ হয় প্রায় ৫০ ফুট। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, এদের পিঠে একটা লম্বা খাঁজ আছে যার ভেতর সদ্যোজাত বাচ্চাকে ঢুকিয়ে নিয়ে তারা ক্যাঙারুর মতো ঘুরে বেড়ায়।

আপাতত এদের নাম রাখা হয়েছে 'ভেনেজুয়েলান মারসুফিয়াল ফ্রগ।' এদের আবিষ্কারক হচ্ছেন আমেরিকার 'সায়ান্স ডাইজেস্ট' পত্রিকার একজন সাংবাদিক, কোনও বিজ্ঞানী নন।

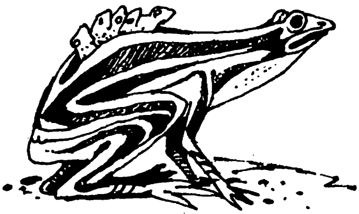

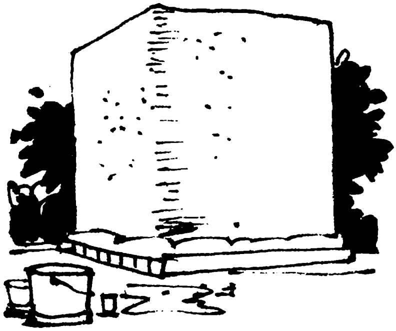

দুশো টাকায় রেফ্রিজারেটর

যে-সব ফল চার-পাঁচ দিন ফেলে রাখলেই পচে যায়, সেগুলোকে যদি অন্তত দিন-পনেরো ভালভাবে রাখা যায় তাহলে চাষিদের অনেক উপকার হয়। তাই দিল্লির 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ' একটা বিরাট রেফ্রিজারেটর উদ্ভাবন করেছেন যা চাষিরা নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারবেন। খরচ পড়বে মাত্র দুশো টাকা। লাগবে না লোহা-লক্কড়, লাগবে না বিদ্যুৎ ; দরকার শুধু সাড়ে তিনশো ইঁট আর ৩৫ বস্তা বেলেমাটি। অবশ্য এই গাঁথুনিতে মাঝে-মাঝে জলের ছিটে দিতে হবে। মাটি আর ইঁটকে এমনভাবে গাঁথা হবে যাতে জলীয় বাষ্প এই গাঁথনির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ছিদ্রের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় ঠাণ্ডা হয়ে আসে। জানলায় খসখস টাঙালে বা মাটির কুঁজোতে জল রাখলে যেভাবে ঠাণ্ডা হয়, এই ব্যাপারটাও অনেকটা সেই রকম। তবে, এই বিশেষ পদ্ধতিতে তাপমাত্রা নেমে আসে শূন্য ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডের কাছাকাছি। অবশ্য রহস্যটা লুকিয়ে আছে গাঁথুনির কারিকুরিতে, যেটা শিখতে কয়েক মাস সময় লাগবে।

অন্ধকারে রাতবিরেতে

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

কেকরাডিহি যেতে হলে ভামপুর জংশনে নেমে অন্য ট্রেনে চাপতে হবে। কিন্তু ভামপুর পৌঁছুতেই রাত এগারোটা বেজে গেল। ট্রেন ঘণ্টাছয়েক লেট। খোঁজ নিয়ে জানলুম, কেকরাডিহি প্যাসেঞ্জার রাত নটায় ছেড়ে গেছে। পরের ট্রেন সেই ভোর সাড়ে-পাঁচটার আগে নয়।

কনকনে ঠাণ্ডার রাত। এরই মধ্যে জংশন স্টেশন একেবারে ঝিম মেরে গেছে। তা ছাড়া, তেমন কিছু বড় জংশন নয়। লোকজনের ভিড় এমনিতে কম। চায়ের দোকানি ঘুমঘুম গলায় পরামর্শ দিল, "পাঁচ লম্বর পেলাটফরমে কেকরাডিহির টেরেন রেডি আছে। চোলিয়ে যান। আরামসে শুত্‌ করুন।"

শুনে তো লাফিয়ে উঠলুম আনন্দে। ওভারব্রিজ হয়ে পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে দেখি সত্যি তাই। ইঞ্জিনবিহীন একটা ট্রেন কালো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্ল্যাটফর্মে জনমানুষটি নেই। মাথার ওপর ছাউনি বলতেও কিছু নেই। একফালি চাঁদ নজরে পড়ল, শীতে তার চেহারাও খুব করুণ।

কিন্তু যে কামরার দরজা খুলতে যাই, সেটাই ভেতর থেকে আটকানো।

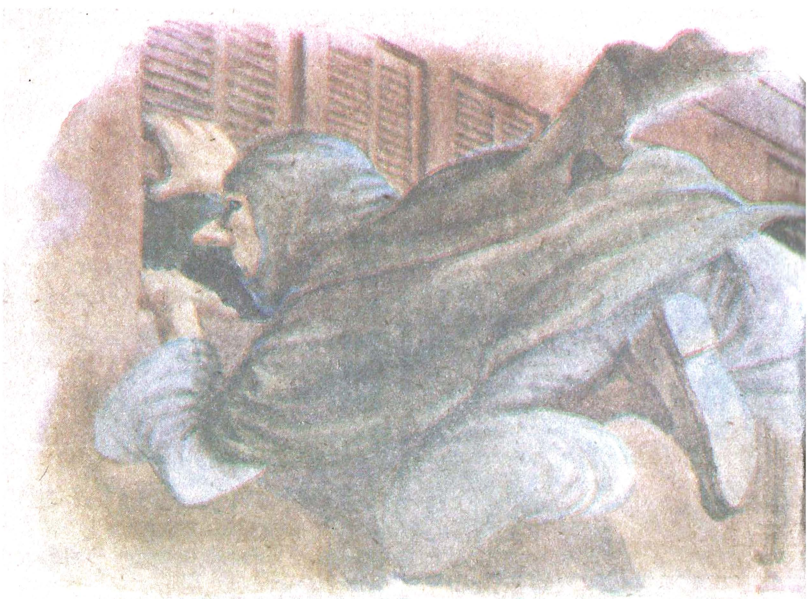

জানালাগুলোও বন্ধ। বুঝলুম ভেতরে বুদ্ধিমান লোকগুলো নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রচুর ওম জমে উঠেছে। দরজা খুলে তা বরবাদ করার ইচ্ছে নেই কারুর। অবশ্য চোর-ডাকাতের ভয়ও একটা কারণ হতে পারে। দরজা টানাটানি করে কোথাও কোনো সাড়া পেলুম না।

হন্যে হয়ে শেষদিকটায় গিয়ে শেষ চেষ্টা করলুম। তখন আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি। চ্যাঁচামেচি করে বললুম, "দরজায় বোমা মেরে উড়িয়ে দেব বলে দিচ্ছি। আমার কাছে বোমা আছে কিন্তু !"

এই শাসানিতেই যেন কাজ হল। একটা জানালা একটু খুলে গেল। তারপর ভারী গলায় কে বলল, "কী আছে বললেন ?"

কথাটা চেপে গিয়ে বললুম, "আহা, দরজাটা খুলুন না ! ঠাণ্ডায় জমে গেলুম যে !"

ভেতরের লোকটি বলল, "বোমা না কী বলছিলেন যেন ?"

"আরে না, না !" হাসবার চেষ্টা করে বললুম, "ওটা কথার কথা ! দয়া করে দরজাটা খুলে দিন।"

"মাথা খারাপ মশাই ? বোমাওয়ালা লোককে ঢুকিয়ে শেষে বিপদে পড়ি আর কি ! বোমা মারতে হয়, অন্য কামরায় গিয়ে মারুন। আমি ঝামেলা ভালবাসি না !"

লোকটা জানালার পাল্লা নামিয়ে দিল দমাস শব্দে। অদ্ভুত লোক তো ! রাগে-দুঃখে অস্থির হয়ে কী করব ভাবছি, সেই সময় গুনগুন করে গান গাইতে-গাইতে একটা লোককে এগিয়ে আসতে দেখলুম। এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়

বনস্পতি অনেক আছে, কিন্তু ডালডা হ'ল একটিই

মমতার কষ্টিপাথরে বংশপরম্পরা ধরে সফল

গত প্রায় চল্লিশ বছর ধরে গৃহিনীদের বিশ্বাসপাত্র··· ডালডা। এটি শুধু নিরামিষ তেলেরই উৎপাদন— সীলবন্ধ— বিশুদ্ধ, শতকরা একশ ভাগ বিশুদ্ধ··· মুখরোচক রান্নার জন্যে যার জুড়ি নেই— আর সবার সেরাও···কারণ, আপনি আপনার পরিবারের জন্যে সবসময় সবার সেরা জিনিষকেই তো স্বাগত জানান।

ডালডা
ব্র্যাণ্ড বনস্পতি

শুধু নিরামিষ তেল দিয়ে পালিত-পোষিত

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

LINTAS DLD 19 15 9 BG

গুনগুনিয়ে গান গেয়ে কেউ আমারই মতো এক বগি থেকে আরেক বগি পর্যন্ত ঢুঁ মেরে বেড়াচ্ছে বুঝি। মিটমিটে আলোয় লোকটির চেহারা নজরে এল। ঢ্যাঙা, হনুমান-টুপিপরা লোক। গায়ে আস্ত কম্বল জড়ানো। লম্বা বিরাট একটা নাক ঠেলে বেরিয়েছে মুখ থেকে। থমকে দাঁড়িয়ে গেল আমাকে দেখে। তারপর খি খি করে হাসল। "ঢোকার ছিদ্র পেলেন না বুঝি? মশাই, এ লাইনের ব্যাপারই এরকম। সেজন্য সুচ হয়ে ঢুকতে হয়। তারপর দরকার হলে ফাল হয়ে বেরুন না কেন?"

কথার মানে কিছু বুঝলুম না। পাগল-টাগল নয় তো? আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে বলল, "আপনি দেখছি একেবারে কচি খোকা! বুঝলেন না কথাটা?"

ঠাণ্ডার রাত। জনহীন প্ল্যাটফর্মে পাগলকে ঘাঁটানো উচিত হবে না। বললুম, "বুঝলুম বৈকি!"

"কচু বুঝেছেন! এই দেখুন, সুচ হয়ে কেমন করে ঢুকতে হয়।" বলে লোকটা সামনেকার একটা জানালা খামচে ধরে এক হ্যাঁচকা টানে ওপরে ওঠাল।

তারপর আমাকে হকচকিয়ে দিল বলা যায়। জানালায় গরাদ আছে। অথচ কী করে সে তার অতবড় শরীরটা নিয়ে ভেতরে গলিয়ে গেল কে জানে! ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম।

কিন্তু তারপরই ভেতরে গণ্ডগোল বেধে গেছে। আগের লোকটা চেঁচিয়ে উঠেছে খ্যানখেনে গলায়, "এ কী মশাই! এ কী করছেন? এ কী! এ কী! আরে..."

এবং কামরার দরজা প্রচণ্ড শব্দে খুলে গেল। সম্ভবত আগের লোকটাই বোঁচকাবুঁচকি-বিছানাপত্র নিয়ে একলাফে নীচে এসে পড়ল। তারপর দুদ্দাড় শব্দ করে ওভারব্রিজের সিঁড়ির দিকে দৌড়ুল।

দেখলুম, একটা বালিশ ছিটকে পড়েছে প্ল্যাটফর্মে। কিন্তু আর ফিরেও তাকাল না এদিকে। এবার সুচ-হওয়া লোকটিকে দেখতে পেলুম দরজায়। খিকখিক করে হেসে বলল, "বেজায় ভয় পেয়ে গেছে। যাক্ গে, ভালই হল। আসুন, আসুন। এক্ষুনি আবার কেউ এসে হাজির হবে। আর শুনুন, ওই বালিশটা কুড়িয়ে নিয়ে আসুন। আরামে শুতে পারবেন।"

বালিশটা কুড়িয়ে নিলুম। ঠিকই বলেছে। বালিশটা শোয়ার পক্ষে আরামদায়কই হবে। এর মালিক যে আর এদিকে এ-রাতে পা বাড়াবে না, সেটা বোঝাই যায়। ব্যাপারটা যাই হোক, ভারী হাস্যকর তো বটেই।

কামরার ভেতরটা ঘুরঘুট্টে অন্ধকার। লোকটা দরজা বন্ধ করে ভেতর থেকে ছিটকিনি নামিয়ে আটকে দিল। দেশলাই জ্বেলে একটা খালি বার্থে বসে পড়লুম। লম্বানেকো লোকটা বসল পাশের বার্থে। তারপর আগের মতো খিকখিক করে হেসে বলল, "খুব জব্দ হয়েছে। একা পুরো একটা কামরা দখল করে বসে ছিল ব্যাটাচ্ছেলে!"

আমিও একচোট হেসে বললুম, "ডাকাত ভেবেই পালিয়েছে, বুঝলেন?"

"উঁহু, ডাকাত ভাবেনি। অন্য কিছু ভেবে থাকবে।"

"কিন্তু আপনি গরাদের ফাঁক দিয়ে ঢুকলেন কী করে বলুন তো?"

"কিচ্ছু কঠিন নয়। সে আপনিও পারেন। তবে তার আগে আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে।"

আগ্রহ দেখিয়ে বললুম, "কী কষ্ট?"

২* বোরোলীন অলিম্পিক গল্পমালা

আধুনিক যুগ

তোমাদের হয়ত অজানা যে বহু বছর আগে বিশ্ব অলিম্পিক বন্ধ হয়ে যায়। কার জন্য বন্ধ হয়, সেটা জেনে রাখা ভাল। ৩৯৩ খৃষ্টাব্দে রোমান সম্রাট থিওডোসিয়াসের নির্দেশে অলিম্পিক বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ১৮৯৬ সালে ফ্রান্সের ব্যারন পিয়ের দ্য কুবারতাঁর অসীম উৎসাহে ঐ গ্রীস দেশের এথেন্স শহরে আধুনিক অলিম্পিক শুরু হয়।

আধুনিক অলিম্পিকের মূলমন্ত্র: 'সিটিয়াস, অলটিয়াস, ফর্টিয়াস' যার মানে আরো দ্রুত, আরো উঁচুতে ও আরো জোরে।

অলিম্পিকের পতাকা আকাশে ওড়ে ১৯২০ সালে এন্টওয়ার্প অলিম্পিকে। পতাকায় আঁকা ৫টি বৃত্ত, ৫টি মহাদেশের মৈত্রী বন্ধনের প্রতীক। প্রত্যেকটি দেশের জাতীয় পতাকাতে এই বৃত্তের রঙগুলির যে কোন একটি পাওয়া যায়।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বছরগুলিতে অলিম্পিক হতে পারে নি। কারণ তখন প্রায় সব দেশই যুদ্ধের উন্মাদনায় ত্রস্ত। এরপর ১৯৮০ সালের মস্কো অলিম্পিকে বহু দেশ রাজনৈতিক কারণে অংশ নেয় নি।

তবু সব বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করে খেলাধূলার এই শ্রেষ্ঠ উৎসব আজও চলছে।

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড আশা মহল, নিউ আলিপুর, কলকাতা ৭০০ ০৫৮

লোকটা অন্ধকারে অদ্ভুত শব্দে হাই তুলে বলল, "যাকগে ওসব কথা। বললেও কি আপনি সে কষ্ট করবেন ?"

"কেন করব না ? অমন সরু ফাঁক গলিয়ে ঘরে ঢোকাটা যে ম্যাজিক মশাই ! আমার ধারণা, আপনি একজন ম্যাজিশিয়ান।"

"তা বলতে পারেন। তবে আমার এখন ঘুম পাচ্ছে।"

অন্ধকারে নড়াচড়ার শব্দ হল। বুঝলুম ম্যাজিশিয়ান লোকটা শুয়ে পড়ল। বালিশটা পেয়ে আমার ভালই হয়েছে। আমিও শুয়ে পড়লুম। কিন্তু অন্ধকারটা অসহ্য লাগছিল। দম আটকে যাবার দাখিল। তা ছাড়া, বন্ধ জায়গায় শোবারও অভ্যাস নেই। তাই একটু পরে উঠে পড়লুম। মাথার কাছের জানালাটা যেই ওঠাতে গেছি, লোকটা হাঁ-হাঁ করে উঠল। "করেন কী, করেন কী ! সুচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরুনোর মতো লোকের অভাব নেই বুঝতে পারছেন না ? অসুবিধেটা কিসের ?"

"দেখুন, বন্ধ ঘরে আমার দম আটকে যায়। বরং একটু ফাঁক করে..."

কথা কেড়ে লোকটা খাপ্পা মেজাজে বলল, "ধ্যাত্ মশাই ! বললুম না ? আবার কে এসে ঢুকবে, তখন আমারই ঝামেলা হবে। আপনার আর কী ! বন্ধ করুন বলছি।"

অগত্যা ফের শুয়ে পড়লুম। কিন্তু ঘুমের দফারফা হয়ে গেছে। একে বন্ধ ঘরের অন্ধকারে অস্বস্তি, তার ওপর প্রচণ্ড হিমকাঠ পিঠের তলায়। সঙ্গে গরম চাদরও নেই। প্যান্ট-কোট হিমে বরফ হয়ে গেছে। পাশের লোকটার গায়ে কম্বল। তাই আরামে ঘুমোচ্ছে। নাকও ডাকছে।

কতক্ষণ পরে চুপিচুপি উঠে বসলুম। হাত বাড়িয়ে মাথার কাছের জানালার পাল্লাটা প্রায় নিঃশব্দে ঠেলে ইঞ্চি-দুই ফাঁক করে রাখলুম। তারপর শুয়ে পড়লুম ফের। এবার বদ্ধ ঘরের সেই অস্বস্তিটা কেটে গেল।

হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিলুম কখন। হঠাৎ কী একটা দুদ্দাড় শব্দে উঠে বসলুম ধুড়মুড় করে। কামরা আগের মতো ঘুরঘুট্টে অন্ধকার। জানালার সেই ফাঁকটা আর নেই। কিন্তু ভেতরে একটা ধস্তাধস্তি বেধেছে যেন। "কে, কে" বলে চেঁচিয়ে উঠে দেশলাই হাতড়াতে থাকলুম। খুঁজে পাওয়া গেল না। ওদিকে দরজাটা দমাস করে খুলে গেল। বাইরে পায়ের শব্দ শুনতে পেলুম। কে যেন দৌড়ে পালিয়ে গেল। তারপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে আমার পাশের বার্থে কেউ এসে বসল। বললুম, "কী ব্যাপার বলুন তো?"

"কিছু না। আপনি শুয়ে পড়ুন। কেকরাডিহি লাইনে এমন হয়েই থাকে।"

কণ্ঠস্বর শুনে একটু চমকে উঠলুম। পাশের বার্থের লোকটার গলার স্বর ছিল একটু খ্যানখেনে। এটা কেমন গুরুগম্ভীর যেন। দেশলাইটা খুঁজে পাওয়া গেল এতক্ষণে। সিগারেট ধরানোর ছলে কাঠি জ্বেলে সেই মিটমিটে আলোয় যাকে দেখলুম, সে অন্য লোক। তবে তার গায়ের কম্বলটা আগের লোকেরই মনে হচ্ছে। এ লোকটার নাক বেজায় চ্যাপটা। তা ছাড়া, মুখে একরাশ গোঁফদাড়ি। মাথার টুপিটাও অন্য রকম। গম্ভীর স্বরে বলল, "কী দেখছেন?"

অবাক হয়ে বললুম, "আগের ভদ্রলোক কোথায় গেলেন বলুন তো?"

"কেন? আমাকে কি সঙ্গী হিসেবে পছন্দ হচ্ছে না?"

"না না—মানে, বলছিলুম কী, আপনিও কি জানালার ফাঁক গলিয়ে ঢুকেছেন?"

"ঠিক তাই। বুঝলেন না? যা ঠাণ্ডা পড়েছে!"

"তা পড়েছে। কিন্তু আপনিও দেখছি একজন ম্যাজিশিয়ান।"

"তা বলতেও পারেন।"

"আগের ভদ্রলোক কোথায় গেলেন?"

হ্যা হ্যা করে হেসে নতুন সঙ্গী বলল, "বেজায় ভয় পেয়ে পালিয়েছে। ব্যাটাচ্ছেলে কাতুকুতুতে ওস্তাদ। কিন্তু আমি কী করি জানেন তো? কামড়ে দিই। আপনি?"

"আমি? আমি কিছুই পারি না।" বলে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লুম। সিগারেটের আগুনে ঘড়ির কাঁটা দেখে নিলুম। দুটো পাঁচ। আর ঘণ্টাতিনেক এসব উপদ্রব সহ্য করে কাটাতে পারলে আর চিন্তা নেই। ঘুম আর এসে কাজ নেই।

পাশের নতুন সঙ্গীর কিন্তু নড়াচড়ার শব্দ নেই। শুয়ে পড়লে টের পেতুম। তাই একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। ওই যে বলল কামড়ে দেওয়ার স্বভাব আছে। হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে কামড়ে দেবে না তো? ভাব করার জন্য বললুম, "কী? শুতে ইচ্ছে করছে না?"

প্রকাণ্ড হাই তোলার শব্দ করে বলল, "নাঃ। আপনি ঘুমোন।"

"ঘুম আসছে কৈ? বদ্ধ ঘরে আমার দম আটকে যায়। সম্ভবত, জানালা খুললে আপনারও আপত্তি হবে। কাজেই..."

"না, না। আপত্তির কারণটা বুঝলেন না? আবার কেউ ঢুকে গণ্ডগোল বাধাবে যে।"

"আগের ভদ্রলোক বলছিলেন, জানালার গরাদ গলিয়ে ঢোকা শিখতে হলে নাকি একটু কষ্ট করতে হবে। কিন্তু কষ্টটা কী, সেটা চেপে গেলেন। আপনি বলতে পারেন, ব্যাপারটা কী?"

"খুব পারি। তবে আপনি ভয় পাবেন যে!"

"মোটেও না। দেখুন না, আমি কি ভয় পেয়েছি?"

হ্যা হ্যা করে হাসল সে। "যাক ওসব কথা। আপনার সিগারেট খাওয়া দেখে লোভ হচ্ছে। একটা সিগারেট দিন, টানি।"

সিগারেট দিয়ে দেশলাই-কাঠি জ্বেলে ধরিয়ে দিতে গিয়ে আবার চমকে উঠলুম। আরে, এ তো সেই গোঁফদাড়িওলা লোকটা নয়। কুমড়োর মতো মুখ, চকচকে টাক—এ আবার কখন এল?

কিন্তু তক্ষুনি আবার গণ্ডগোল বেধে গেল। পাশ থেকে কে চেঁচামেচি করে বলল, "এই মশাই! আমার সিগারেট আপনি টানছেন যে! জিজ্ঞেস করুন তো ওঁকে, কে সিগারেট চাইল।"

ফস্ করে আবার কাঠি জ্বাললুম। দেখি, গোঁফদাড়িওলা লোকটি কুমড়োমুখো লোকটির পাশে বসে আছে। তার মুখে-চোখে রাগ ঠিকরে বেরুচ্ছে। ঘাবড়ে গিয়ে বললুম, "কী মুশকিল! আপনি আবার কীভাবে ঢুকলেন?"

নতুন লোকটি অদ্ভুত হেসে বলল, "আমি আগে থেকেই ছিলুম। অনেকক্ষণ থেকে সিগারেটের গন্ধ পাচ্ছিলুম। সাহস করে আসতে পারছিলুম না। এ ভদ্রলোকের যে কামড়ে দেওয়া অভ্যেস!"

গোঁফদাড়ি হেঁড়ে গলায় বলল, "এবার যদি কামড়ে দিই!"

"সিগারেটের ছ্যাঁকা দেব। আসুন না কামড়াতে।"

বিবাদ মিটিয়ে দিতে বললুম, "আহা, ঠাণ্ডার রাতে কামড়া-কামড়ি ভাল কাজ নয়। নিন, আপনিও একটা সিগারেট নিন।"

আমি আবার পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লুম। চোখ দুটো পাশের বার্থের দিকে। দুটো সিগারেট জুগজুগ করে জ্বলছে অন্ধকারে। এবার কেন কে জানে, ঘুমে চোখের পাতা জড়িয়ে যাচ্ছিল। তারপর কখন সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছি।

হইহট্টগোলে সেই ঘুম যখন ভাঙল, তখন দেখি কামরা জুড়ে একদঙ্গল লোক। বোঁচকাবুঁচকিও কম নেই। এখন আলো জ্বলছে। জানালাগুলো হাট করে খোলা। এই রে! সর্বনাশ হয়েছে তাহলে। গরাদ গলিয়েই পিলপিল করে এরা বুঝি ঢুকে পড়েছে। ধুড়মুড় করে উঠে বসলুম। অমনি খালি জায়গা পেয়ে একদল লোক হইহই করে এসে বসে পড়ল। দুজনকে সিগারেট দিয়ে সামলেছি, এতজনকে কীভাবে সামলাব ভেবে খুব ভয় পেয়ে গেলুম।

কিন্তু তারপর চোখ গেল দরজার দিকে। দরজা খোলা। অতএব এরা তারা নয়। তাদের তন্নতন্ন করে খুঁজে পেলুম না। তারা কোথায় গেল, গোঁফদাড়ি এবং কুমড়ো—অর্থাৎ সেই অন্ধকারের ম্যাজিশিয়ানরা?

আমার মাথার তলা থেকে বালিশটাও উধাও। যাক্ গে, একটা অভিজ্ঞতা হল তাহলে। টিকিটের ঘণ্টা দিচ্ছিল। পাঁচটা বাজে।

ছবি বিমল দাস

টাসকেন

মুক্তিনাথ গুপ্ত

বুবলা একটা লোককে দেখছে। মা বেরিয়ে আসেন বারান্দায়। বলেন, "কী দেখছিস রে?"

বুবলা বলে, "দ্যাখো মা, ঠিক সেই লোকটা না? সেই টাসকেন!"

মা ভাবেন, সুদূর টোডাদের গ্রাম থেকে, সেই নীলগিরি পাহাড় থেকে ঐ লোকটা এখানে কী করে আসবে? হয়তো অন্য কোনো লোক, দেখতে প্রায় একরকম। সেইটেই সম্ভব। তবু, মনের ভেতরটা কীরকম খচ্‌খচ্‌ করতে থাকে।

দোতলার গাড়িবারান্দা থেকে মনিপ্ল্যান্টে ঘেরা গ্রিলের ফাঁক দিয়ে সব দেখা যায়। আশ্চর্য! লোকটাও পেছন

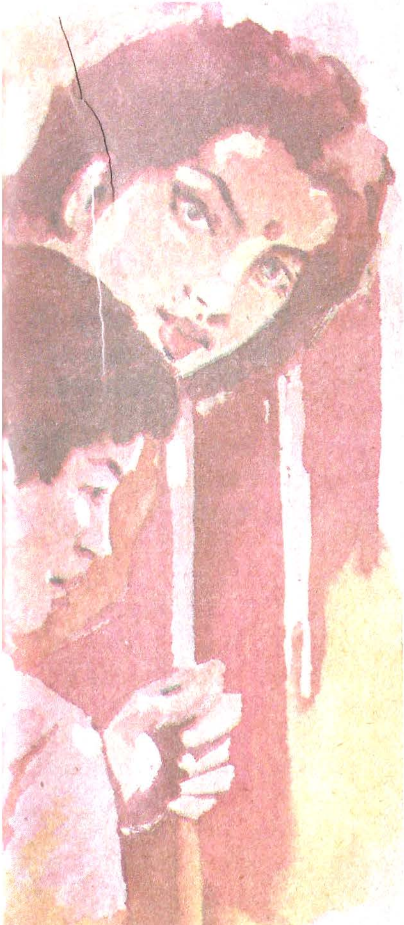

ফিরে দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। নড়বার নামটি নেই।

বুবলার বাবা দীপেনবাবু বাজার থেকে এসে কলতলার পাশে বাজারের থলি নামালেই রোজ বুবলা ছুটে আসে বাবা কী মাছ এনেছেন দেখতে, সে পড়ার টেবিলেই থাক আর যেখানেই থাক। আজ কলিং বেল বেজেছে। ঝুমরি দরজা খুলেছে। তিনি রোজকার মতো পা টিপে টিপে কলতলায় গেছেন। কিন্তু কই, বুবলার পাত্তা নেই! বেশ আশ্চর্যই হন তিনি। কোথায় গেল বুবলা! শুধু তাই নয়, বুব্‌লার পিছু-পিছু ওর মা'ও আসেন। একটু পরেই তো দীপেনবাবুকে কলেজ যেতে হবে!

কিন্তু কই! না বুবলা, না তার মা। কোথায় গেল তারা আজ?

কাজের মেয়ে ঝুমরিকে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করলেন দীপেনবাবু, "বুবলা আর বুবলার মা কোথায় গেল রে?"

ঝুমরি ঠিক জানে না ওরা কী দেখছে। বলল, "ওই তো, রাস্তার দিকের বারান্দায়।"

পা টিপে-টিপে দীপেনবাবু বারান্দার দিকে এগিয়ে গেলেন।

ওরা তখনও দেখছে। দীপেনবাবু ওদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

ওরা তখন সেই লোকটিকে দেখছে। মাঝে-মাঝে লুকিয়ে পড়ছে, আবার এগিয়ে গিয়ে দেখছে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে কি না। লোকটাও কীরকম যেন! ওপারের রাস্তার দোকানটায় কী একটা কিনছে। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার কী আছে! লোকটা কি সত্যিই সেই লোকটা?

মা-ছেলেতে যে সব জল্পনা-কল্পনা হচ্ছে, তা তিনি কী করে জানবেন!

তিনি গিয়ে দাঁড়াতেই চমকে উঠে বুবলা বলল, "কে?"

লোকটাও বোধহয় অমনি একবার তাকাল এইদিকে, আর তারপরেই চলে গেল।

বুবলাও পেছন ফিরে দেখল, বাবা এসেছেন। কিন্তু লোকটা তখন চলে গেছে।

দীপেনবাবু বললেন, "কী ব্যাপার?

তোমরা এত মনোযোগ দিয়ে কী দেখছিলে ?"

বুবলা বলল, "টাসকেন।"

বুবলার মা স্বাতী বললেন, "টাসকেন।"

দীপেনবাবু জানেন, বুবলার মাথায় সর্বদাই অনেক প্ল্যান, অনেক গোয়েন্দা, অনেক জীব-জন্তু, পাহাড়, সমুদ্র, নক্ষত্র-রহস্য ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু স্বাতীর মাথাতেও যে বুবলার প্ল্যানগুলো সংক্রামিত হয়েছে, তা জানতেন না ! তাই স্বাতীর দিকে তাকিয়ে বলেন, "টাসকেন ! মানে ?"

বুবলা অমনি বলে ওঠে, "হ্যাঁ বাবা, টাসকেন।"

স্বাতীও বলেন, "আহা, বুঝতে পারছ না ? টাসকেন।"

দীপেনবাবু মনে মনে কিছু বোঝবার চেষ্টা করেন। তাঁর মুখ থেকে স্বগতোক্তির মতো বেরিয়ে আসে, "টাসকেন !" অবশ্য তখনও তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি যে ব্যাপারটা কী।

স্বাতী বলেন, "লোকটা চলে গেল।" বুবলাও বলল, "লোকটা চলে গেল।"

দীপেনবাবু একবার বুবলা আর একবার স্বাতীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "কোন লোকটা ?"

স্বাতী বললেন, "সেই লোকটা। সেই যে সেই টাসকেন।"

এতক্ষণে বোধহয় দীপেনবাবুর মনে পড়ে, সেই নীলগিরি পাহাড়ের ঘটনার কথা। কিন্তু তার সঙ্গে আজকের এই মুহূর্তের ঘটনার কী সম্পর্ক, তা তিনি বুঝতে পারেন না। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেন, "কিন্তু এখানে কী ?"

বুবলা বলে, "জানো বাবা, সেই টাসকেন-বুড়োটা এসেছে।"

"কোথায় ?"

"এখুনি চলে গেল। ঐ দোতলায় দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ।"

দীপেনবাবু বললেন, "তাই হয় নাকি ? কোথায় সেই নীলগিরি পাহাড়ের টোডা, আর কোথায় কলকাতা ! আর ও এখানে আসবেই বা কেন ? ওরা কি এখানকার কিছু চেনে ?"

স্বাতী বললেন, "বা রে, আমরা যদি কিছু না চিনেও নীলগিরি যেতে পারি, তাহলে ওরাও কিছু না জেনে এখানে আসতে পারবে না কেন ?"

দীপেনবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তা ঠিক, কিন্তু আমরা তো অনেককিছু জানি ! আর আমরা বেড়াতে গিয়েছিলাম। ও লোকটা আসবে কেন ? ও কি বেড়াতে এসেছে ?"

"হতেও পারে। ওর বুঝি বেড়াতে ইচ্ছে হয় না ?" বলল বুবলা।

দীপেনবাবু বললেন, "কিন্তু ওরা সাধারণত ওদের পরিবেশের বাইরে আসে না। তার ওপর ওরা খুব গরিব ! এত খরচ করে ও আসবেই বা কেন ?"

স্বাতী অমনি বলে উঠলেন, "তুমি ভাল করে দ্যাখোনি লোকটাকে। বুবলার জন্যে ও সব জায়গায় যেতে পারে। বুড়োটা কীরকম করে তাকাচ্ছিল বুবলার দিকে, তুমি দেখেছ সেই নীলগিরি পাহাড়ে ?"

"কই, সেরকম কিছু তো মনে হয়নি !" দীপেনবাবুর গলাটা স্বাতীর তুলনায় কীরকম যেন কমজোর মনে হয়। তাঁর নিজেরই মনে হয়, বলাটা ঠিক জোরালো হয়নি।

"না বাবা, লোকটাকে আমার একটুও ভাল লাগেনি।"

বুবলা ক্লাস ফাইভে পড়ে ক্যালকাটা বয়েজ-এ। ও ওর ক্লাসের লিডার। ও নানান প্ল্যান দেয় ওর বন্ধুদের। একদিন

তো ঘুমের মধ্যে উড়েই চলে গিয়েছিল ফ্ল্যাশ গর্ডনের সঙ্গে, পৃথিবী থেকে অনেক দূরে, অন্য নক্ষত্রে। অবণ্যদেব ওর হিরো, টিনটিন ওর বন্ধু। আজকাল ও অরণ্যদেব বলে না, বলে ওয়াকার-কাকু। ব্রুস্ লি'র কুং ফু প্রায়ই মা-বাবাকে সহ্য করতে হয় ঘুমের মধ্যে। প্রায়ই টারজানের ডাক নকল করবার চেষ্টা করে বুবলা।

স্বাতী আর দীপেন কিছুতেই পেরে উঠছেন না ওর সঙ্গে। নিত্য নতুন খেয়াল। প্রতিবছর গরমের আর পুজোর ছুটিতে ওদের বাইরে যেতেই হবে। পাহাড়, নদী, অরণ্য, সমুদ্র সব চেনাতে হবে। ওদের সম্বন্ধে সব কিছু বলতে হবে। বাবা-মা ওর 'এনসাইক্লোপিডিয়া'। যদি কোনোদিন কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারেন স্বাতী কিংবা দীপেন, ও এমনভাবে তাকায়, যার মানে হচ্ছে, 'ছি ছি, এও জানো না ?'

দীপেন ইংরেজির অধ্যাপক। কিন্তু বুবলার জন্যে তাঁকে আজকাল ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, অঙ্ক, বায়োলজি, ইলেক্ট্রনিক্স, মহাকাশ-গবেষণা, সবই পড়তে হচ্ছে। সকাল থেকে রাত্রি বারোটা-একটা পর্যন্ত পড়েও হাবুডুবু খাচ্ছেন দুজনে। আজকাল ওঁরা ভাগ করে নিয়েছেন পড়াশুনো। স্বাতী পড়ছেন ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণ-কাহিনী, অরণ্যদেব, ফ্ল্যাশ-গর্ডন, মহাকাশ-গবেষণা। আর দীপেন যত শক্ত শক্ত বিজ্ঞানের নথিপত্র। স্বাতীর বা দীপেনের এম এ পাশ করবার সময়ও এত পড়তে হয়নি কোনোদিন। বুবলা ওদের নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে মাঝে মাঝে। আর তার প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারলেই ওদের মাস্টারমশাই যেরকমভাবে ছাত্রের দিকে তাকায়, সেও ঠিক সেইভাবে তাকায় তার মা-বাবার দিকে।

এহেন ছেলের টাসকেন-বুড়োকে দেখে ভয় লাগতে পারে, সেটাই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। তবে আজকাল বুবলার প্রশ্ন একটু কমেছে। মাঝে মাঝে ও কীরকম অন্যমনস্ক হয়ে যায়, চেঁচিয়ে ওঠে।

সেদিন পড়তে পড়তে বুবলা উঠে আসে মায়ের কাছে। মায়ের কোলের কাছে বসে পড়ে। এমনভাবে ও কোনোদিন বসে না। ওকে যে অরণ্যদেব, ব্রুস লি হতে হবে ! কিন্তু সেদিন যেন একটু অন্যরকম।

"আচ্ছা মা, ঐ বুড়োটা কি এই পৃথিবীর লোক ?"

"কেন, তোর কী মনে হচ্ছে ?"

"আমার মনে হয় ও বোধহয় অন্য গ্রহ থেকে এসেছে।"

"তোর কি ওকে ভয় করে ?"

"জানো মা, এতদিন ভাবছিলাম, অরণ্যদেবকে বললেই তো ওর সব চালাকি ধরা পড়ে যাবে, কিন্তু কেন যে ওকে সেই নীলগিরি পাহাড়ে দেখেই আবার কীরকম মনে হয়েছিল, আজ বুঝতে পারছি।"

বুবলা কথা বললে স্বাতী বা দীপেনকে গম্ভীর হয়ে থাকতে হয়, ওর কথায় গুরুত্ব দিতে হয়, নইলে ও ভীষণ রেগে যায়।

স্বাতী গম্ভীর হয়ে বলেন, "তোর কী মনে হচ্ছে ?"

"বহুদিন আগে যখন একদিন নীলগিরি পাহাড়ের মতো পাহাড়-ঘেরা নেপচুনে যাচ্ছিলাম ক্যাসিওপিয়া নক্ষত্রমণ্ডলীর কাছ দিয়ে, ফ্ল্যাশ্ গর্ডনের সঙ্গে, তখন ঐ বুড়োর মতো একজনকে দেখেছিলাম। হঠাৎ একটা রকেট আমাদের মহাকাশযানকে প্রচণ্ড বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল। আমরা ওর পথ থেকে দূরে

"একটুখানি খাটিয়ে মাথা জুড়ে পরের পর
ওকে দিয়ে সাজিয়ে তোলো তোমার
খেলাঘর!"—

ফেভি ফেয়ারী

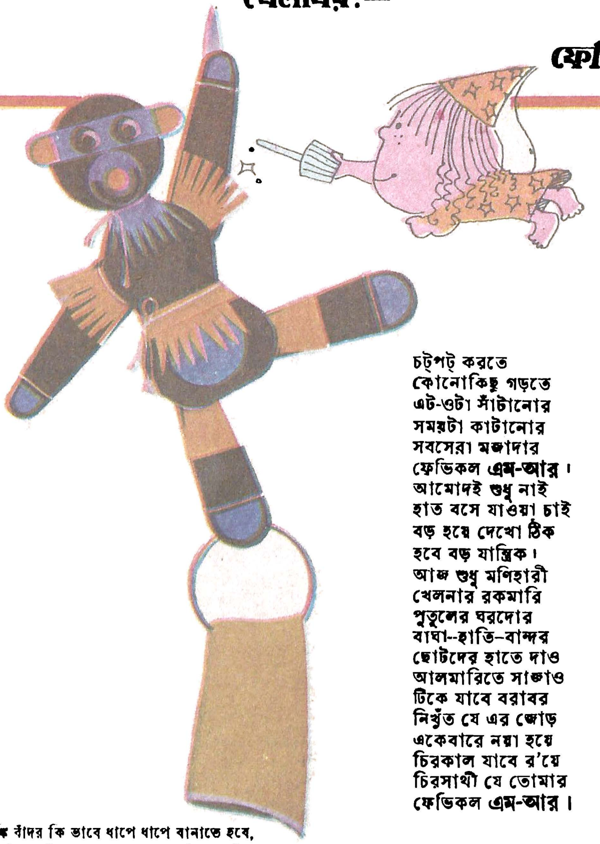

চট্‌পট্ করতে
কোনোকিছু গড়তে
এট-ওটা সাঁটানোর
সময়টা কাটানোর
সবসেরা মজাদার
ফেভিকল এম-আর।
আমোদই শুধু নাই
হাত বসে যাওয়া চাই
বড় হয়ে দেখো ঠিক
হবে বড় যান্ত্রিক।
আজ শুধু মণিহারী
খেলনার রকমারি
পুতুলের ঘরদোর
বাঘা-হাতি-বান্দর
ছোটদের হাতে দাও
আলমারিতে সাজাও
টিকে যাবে বরাবর
নিখুঁত যে এর জোড়
একেবারে নয়া হয়ে
চিরকাল যাবে র'য়ে
চিরসাথী যে তোমার
ফেভিকল এম-আর।

মঙ্কি বাঁদর কি ভাবে ধাপে ধাপে বানাতে হবে, সে বিষয়ে বিনামূল্যে তথ্যের জন্য এই কুপনটি পাঠান বা এই ঠিকানায় লিখুন: "ফেভি ফেয়ারী" পোষ্ট বক্স ১১০৮৪, বোম্বাই ৪০০ ০২০

মঙ্কি-বাঁদর কি ভাবে ধাপে ধাপে বানাতে হবে, সে বিষয়ে বিনামূল্যে তথ্যের জন্য এই কুপনটি এই ঠিকানায় পাঠান: "ফেভি ফেয়ারী," পোষ্ট বক্স ১১০৮৪, বোম্বাই ৪০০ ০২০

নাম: ____________________

বয়স: ____________________

ঠিকানা: ____________________

____

সহর: ____________________

রাজ্য: ____________ পিনকোড: ________

আপনি কি আমাদের ফেভিক্র্যাফট—পত্রিকাটি পেয়েছেন? হাঁ/না

®

এম-আর

ফেভিকল

সিন্থেটিক অ্যাডহীসিভ

OBM-2697 BN

সেরা জিনিষ গড়তে চাও সেরাটি দিয়েই জুড়ে নাও

® Both "[logo]" and FEVICOL brand are the Registered Trade Marks of PIDILITE INDUSTRIES PVT LTD, Bombay 400 (s'

সরে যেতে চাইছি, এমন সময় ঐ রকেটটা তীব্র গতিতে এসে আমাদের যানের সঙ্গে আটকে গেল, আর তার থেকে বেরিয়ে এসেই যে লোকটি আমাকে ওর সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, সে-ই ছিল নীলগিরি পাহাড়ে। যখন আমি আমার মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে ওকে নিরস্ত করলাম, ও চলে গেল নিজের রকেটে। তবে যাবার সময় বলে গেল আমাকে দেখিয়ে, 'আমি ওকে নেবই যেমন করে হোক।' ও বোধহয় আমাকে নিতে এসেছে মা!"

স্বাতী জানেন, এগুলো ওর কল্পনা। তবু যেন তাঁর ভেতরটা অমঙ্গলের আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে। বলেন, "না, না, ঐ বুড়োটা দেখলি না টোডা সম্প্রদায়ের একটা বুড়ো! ও ওর মেয়ের বিয়ের জন্যে আশীর্বাদ করছিল 'টাসকেন' বলে। আমরা যেমন বলি, তুমি সুখী হও বা দীর্ঘজীবী হও, ওরা হয়তো তেমনি বলে, 'টাসকেন'। ও সেই লোকটা হতেই পারে না। বাবাকে জিজ্ঞেস করিস।"

দীপেনবাবু তাঁর পড়ার ঘরে বসে পড়াশুনো করছিলেন। বুবলার সঙ্গে-সঙ্গে স্বাতীও সেই ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

বুবলা সব ব্যাপারটা বাবাকে বলল। দীপেনবাবু শুনে বললেন, "কিন্তু তোমায় নিয়ে যাবে কেন?"

বুবলা গম্ভীর হয়ে বলল, "আমারই মনের শক্তির জন্যে বোধহয় ও আমাদের কিছু করতে পারেনি। আর, সেই অন্য গ্রহের লোকটির কাছেও আমি ঐ সাঙ্কেতিক 'টাসকেন' শব্দটা শুনেছিলাম।"

"তাহলে তো ও তোমায় আশীর্বাদ করেছিল।"

"সেইজন্যেই তো ও আমাকে চায়। সেদিন আমাদের মহাকাশযানের ওরা কিছু করতে পারেনি আমারই জন্যে। আমি যদি কিছুদিন বাড়ি থেকে না বেরোই, তাহলে হয়তো লোকটা চলে যাবে।"

স্বাতী বললেন, "তাই হোক। ওকে কিছুদিন ইস্কুল যেতে হবে না, বাড়ির বাইরেও বেরোতে হবে না।"

দীপেনবাবু তাকালেন বুবলার দিকে। বললেন, "আচ্ছা দেখি আমি কী করতে পারি।"

তিনি সোজা চলে গেলেন ইস্কুলে প্রিন্সিপ্যালের কাছে।

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, "আপনার ছেলে খুবই ইন্‌টেলিজেন্ট, রেজাল্ট খুব ভাল, সবই ভাল। কিন্তু ও ওর ক্লাসের বন্ধুদের নানানরকম অলৌকিক গল্প, কল্পবিজ্ঞানের গল্প বলে ভয় দেখায়। বলে কিনা অন্য গ্রহ থেকে একটি লোক, তার কোড্-ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে টাসকেন, যত ব্রেনি বয়েজদের ধরে নিয়ে যাবে। তাই আমি ওকে খুব বকেছি, কারণ আমার ইস্কুলে ছেলেদের অ্যাটেন্‌ডেন্স্ ফল্ করছে। গার্জেনরাও কমপ্লেন করছেন।"

দীপেনবাবু বললেন, "ও সত্যিই ভয় পেয়েছে আপনার বকুনিতে। ইস্কুল আসতে চাইছে না।"

প্রিন্সিপ্যাল হেসে বললেন, "তাই নাকি? স্ট্রেঞ্জ! মূষিক তাহলে নিজের কলে নিজেই পড়েছে। তবে সত্যি খুবই ব্রাইট্ বয়, আমার স্কুলের অ্যাসেট্।"

দীপেনবাবু ফিরে এলেন। এসে গম্ভীর হয়ে বললেন, "বুবলা, তোমার প্রিন্সিপ্যালের কাছে গিয়েছিলাম।" বলেই চলে গেলেন নিজের ঘরে।

বুবলা এখন ভাবছে, টাস্‌কেন মানে কী। আশীর্বাদ, না শাস্তি!

ছবি : অনুপ রায়

আঃ মেলা/ফর্মা-২ (৪· ৪· ৮৪)

"ওর বয়স মাত্র ন'বছর,
আর এখনই ও বলছে,
একদিন ও হবে বিশ্বের
সেরা অল-রাউণ্ডার
আর, তাতে ও নিশ্চয়ই
হবে, সে দৃঢ় বিশ্বাস ও
রয়েছে আমার।"
বোর্নভিটাভরা বর্ষগুলি
যার জন্যে এরা একদিন আপনাকে জানাবে তাদের কৃতজ্ঞতা।
বাড়ন্ত বাচ্চারা, অন্য আর সব মল্টেড পানীয়ের মধ্যে বোর্নভিটা-ই কেন সবচেয়ে বেশী পছন্দ করে?
দু'পুরুষ ধরে যেসব মা বাবারা বোর্নভিটা খেয়েই বড় হয়ে এসেছেন, তাঁরা খোলাখুলিভাবে কেন বলেন, "আমার বাচ্চাদের জন্যেও বোর্নভিটা-ই সবচেয়ে বেশী কাজের জিনিষ?"
বাচ্চাদের জিজ্ঞেস ক'রে দেখুন
তাদের মা বাবাদের জিজ্ঞেস ক'রে দেখুন
আপনি নিজেকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখুন
এ শুধু যে এটির মজাদার স্বাদের জন্যে তা নয়—এমনকি ক্যাডবেরিস্ নামটির জন্যেও নয়—এর কারণ অন্য কিছু—আরও বিশেষ কিছু—
এ হ'ল বোর্নভিটা, যে পানীয়ের গুণ বলে, তুমি বেড়ে চলো!
ক্যাডবেরিস্
বোর্নভিটা
Money Saving Refill Pack
Cadbury's
Bournvita
SAVE Rs.1.50
The Tastier Food Drink
Cadbury's
Bournvita
The Tastier Food Drink
পালন-পোষণ সঠিকভাবে করুন, বাচ্চাদের বোর্নভিটা খাওয়ান।
OBM/2661-BEN

কালো পর্দার ওদিকে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : দিপু আর ওর দিদি ইরানি ট্রেনে করে বর্ধমানের এক গ্রামে যাচ্ছিল ওদের জ্যাঠামশাইয়ের খোঁজ নেবার জন্য। তিনি সেই গ্রামের বাড়িতে একলা থাকেন। আসবার পথে ট্রেনে ওরা একদল ডাকাতের পাল্লায় পড়েছিল, খাকি প্যান্ট আর হলদে গেঞ্জি পরা একজন লোক ডাকাতদের কাবু করে ফেলে। পরের স্টেশনে পুলিশ আসবার আগেই কিন্তু সেই লোকটি চলন্ত ট্রেন থেকে নেমে যায়। যাবার সময় ইরানিকে বলে যায়, আবার দেখা হবে! দিপু আর ইরানি ট্রেন থেকে নেমে বাসে চেপে সেই গ্রামের কাছাকাছি এসে শুনল, ওদের জ্যাঠামশাইকে কয়েকদিন ধরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তারপর···

॥ ৬ ॥

দেখতে দেখতে দিপুদের চারপাশে আবার একটা ভিড় জমে গেল। গ্রামের লোকদের তো অফিসে যেতে হয় না, তাই দুপুরের দিকেও অনেক লোক এমনি এমনি ঘুরে বেড়ায়। তারা এসে বলতে লাগল, 'কী হয়েছে? কী হয়েছে? রামবাবুকে খুঁজছে? ইশ্, কী যে হল, অমন ভাল মানুষটা, কোথায় যে গেল!'

একজন মোটাসোটা মোড়লমতন চেহারার লোক বলল, "সেই যে গত সোমবারে বাজ পড়ল ওনার বাগানে, পেয়ারাগাছগুলো পুড়ে গেল! সেই দুঃখেই রামবাবু কোথায় চলে গেলেন! বড় সাধের পেয়ারাবাগানখানা ছিল ওনার!"

আর একজন ধুতিপরা, খালি-গা লোক বলল, "বাজ মানে কী, ওরে বাপ রে! বাপের জন্মে এমন বাজ-পড়া দেখিনি। পুকুরের জল পর্যন্ত শুষে নিয়েছে! আমি দেখতে গেসলুম!"

দিপু বাজ পড়ার ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছে না। বর্ষাকালে আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়, তারপর মেঘে-মেঘে গুড়ুম-দড়াম আওয়াজ হয়। কেন এরকম হয় তা দিপু জানে। কিন্তু আকাশের বিদ্যুৎ পুকুরের জল শুষে নেয় কী করে? বাজ কি কোনো জ্যান্ত জিনিস যে তার জলতেষ্টা পাবে?

মোড়লমতন লোকটি দিপুকে বলল, "তোমরা এত দূরের পথ ঠেঙিয়ে এসেছ, খাওয়া-দাওয়া হয়নি নিশ্চয়ই! চলো, আমার বাড়িতে চলো, একটু জিরিয়ে নেবে।"

ইরানি একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। দিপু একবার তার দিকে তাকিয়ে বলল, "না, আমরা জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতেই আগে যাব!"

"সে-বাড়িতেও তো কেউ নেই। এই দুপুর-রোদে সেখানে গিয়ে কী করবে? খাবে-দাবে কোথায়? আমাদের গ্রামে এসেছ, না-খাইয়ে তোমাদের কি ছাড়তে পারি?"

অন্য দু' তিনজন লোক 'তা তো বটেই,

তা তো বটেই' বলে উঠল।

দিপু জানে, তার দিদি অচেনা লোকের বাড়িতে কিছুতেই খেতে চাইবে না। দিদির অনেক রকম পিটপিটিনি আছে। যদিও খিদে পেয়েছে বেশ!

একজন লোক বলল, "রামবাবুর বাড়িতে যে কাজ করত সেই মধুকে যেন সকালবেলা একবার দেখেছিলাম এদিকে?"

আর একজন বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই তো একটু আগে মধুকে দেখলাম পোস্টাপিসের দিকে যাচ্ছে।"

মোড়লমতন লোকটি বলল, "ডাক তো, মধুকে ডেকে নিয়ে আয় তো!"

সাইকেল-ভ্যান চালিয়ে একজন লোক এসে দাঁড়িয়েছিল ভিড়ের পাশে। সেই লোকটি বলল, "মধু বাড়ির দিকে ফিরে গেল দেখলুম এই মাত্তর!"

দিপু সেই লোকটিকে বলল, "আপনি আমাদের ঐ ভ্যানে করে পৌঁছে দেবেন?"

লোকটি বলল, "হ্যাঁ, উঠে বোসো! মাত্তর তো দেড় মাইল রাস্তা!"

সাইকেল-ভ্যানে মালপত্তর নিয়ে যায়, মানুষও যায় অনেক সময়। পা ঝুলিয়ে বসতে হয়। দিপু, ইরানি আর রঘু তিনদিকে বসল পা ঝুলিয়ে। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা, মাঝে-মাঝেই ঝাঁকুনিতে ওরা লাফিয়ে উঠছে।

ইরানি বলল, "এখানে পোস্ট অফিস আছে। আগে ওখানে পৌঁছে ভাল করে খোঁজখবর নিই। তারপর বাড়িতে টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে।"

রঘু বলল, "এই ভ্যানওয়ালা দাদাকে বলতে হবে আমাদের এস্টেশানে পৌঁছে দিতে। মা বলে দিয়েছেন, রাত্তিরের মধ্যে বাড়ি ফিরে যেতে।"

ইরানি বলল, "উঁহুঃ, আজ আর ফেরা হবে না। জ্যাঠামশাইয়ের খোঁজ না নিয়ে ফিরব কী করে?"

রঘু বলল, "জ্যাঠাবাবু কলকাতাতেই চলে গিয়েছেন। এখেনে বাজ পড়ে সব নষ্ট হয়ে গেছে তো!"

ইরানি বলল, "শুনলি না, তিনদিন ধরে জ্যাঠামশাইয়ের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না! কলকাতায় যেতে বুঝি তিনদিন লাগে?"

দিপু কোনো কথা বলছে না। সে চেয়ে আছে মাঠের দিকে। রাস্তার দু' দিকেই মাঠ। ধান কাটা হয়ে গেছে, এখন ফাঁকা। অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে গাছপালার সারি। এর মাঝখানে আর কোনো বাড়িঘর নেই। রোদ ঝকঝক করছে। দিপুর মনে হচ্ছে সেই রোদ্দুরের মধ্যে কী যেন দুলছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন। এক এক জায়গায় রোদ্দুর যেন ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। তিমি মাছ যেমন ফোয়ারার মতন জল ছুঁড়ে দেয় সেইরকম কোনো-কোনো জায়গায় আলো উঠে যাচ্ছে ওপরের দিকে।

ইরানি আর রঘুর মুখের দিকে তাকাল দিপু। ওরা কথাই বলে যাচ্ছে। রোদ্দুরের মধ্যে এই অস্বাভাবিক ব্যাপারটা ওরা দেখতে পাচ্ছে না? ওদের ডেকে দেখাবার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। অনেক সময়ই এমন হয়, দিপু যা দেখতে পায় অন্যরা তা দেখে না।

খানিকদূর যাবার পর দেখা গেল সামনে দিয়ে একজন লোক হেঁটে যাচ্ছে। লোকটি বেশ লম্বা আর বলশালী, কুচকুচে কালো গায়ের রং, খালি গা।

সাইকেল-ভ্যানওয়ালা বলল, "ঐ তো মধু!"

দিপুর মনে পড়ল, আগেরবার এসে

একে কিছুক্ষণের জন্য দেখেছিল, ভাল করে ভাব হয়নি। জ্যাঠামশাই ওকে ঝাড়গ্রামে পাঠিয়েছিলেন গাছের চারা আনবার জন্য।

ভ্যানটা কাছাকাছি যেতেই দিপু নেমে পড়ে লোকটির সামনে গিয়ে বলল, "ও মধুদা! আমরা কলকাতা থেকে এসেছি, জ্যাঠামশাইয়ের খোঁজ নেবার জন্য!"

লোকটি অবাক হয়ে তাকাল দিপুর দিকে। তারপর মুখ ফিরিয়ে রঘু আর ইরানিকে দেখল, তারপর বলল, "কলকাতা থেকে? বাবুর ছেলে কোথায়?"

দিপু বলল, "দাদার পরীক্ষা। তাই দাদা আসতে পারেনি। আমি আর দিদি এসেছি। আমাদের মনে আছে আপনার? সেই যে দু' বছর আগে এসেছিলুম?"

মধু একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বলল, "কী যে হল! বাবু কোথায় চলে গেলেন, কিছুই বুঝতে পারছি না। আমায় সেদিন দুপুরবেলা বললেন, শরীরটা ভাল লাগছে না রে মধু, মাথা ঘুরছে। আমি বললুম, হেল্‌থ সেণ্টারের ডাক্তারবাবুকে খবর দেব? উনি বললেন, থাক্, আজকের দিনটা দেখি! তারপর সন্ধেবেলা সেই কাণ্ড!"

দিপু জিজ্ঞেস করল, "কী কাণ্ড?"

মধু বলল, "আমি ঘোড়াডাঙায় গেসলুম পটাস সার আনতে। ফিরে এসে দেখি, পুকুরঘাটে বাবু কাত হয়ে পড়ে আছেন। কোনো সাড়াশব্দ নেই। আমি দু' তিনবার ডাকলুম, তাও সাড়া দিলেন না। আমি দৌড়ে এসে ধরে দেখি, বাবু অজ্ঞান। সত্যি কথা বলতে কী, প্রথমে ভেবেছিলুম, বুঝি বা মরেই গেছেন। পুকুর থেকে আঁজলা করে জল এনে মুখে ঝাপ্‌টা দিতে চোখ মেলে তাকালেন।"

ইরানিও ভ্যান থেকে নেমে পড়েছে। সে এই কথা শুনে দিপুর দিকে চোখ বড় বড় করে তাকাল। খুবই অদ্ভুত ব্যাপার। বাবা ঠিক এই কথা বলেছিলেন। জ্বরের ঘোরে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, জ্যাঠামশাই পুকুরঘাটে একা-একা পড়ে আছেন। এরকম কী করে হয়?

দিপু জিজ্ঞেস করল, "তারপর?"

মধু বলল, "আমাকে দেখে বাবু বললেন, 'কে, মধু? এতক্ষণ কোথায় ছিলি? আমি মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলুম বুঝি? আমায় একটু ধর তো, উঠে

দাঁড়াই ! পায়ে চোট লেগেছে।’ আমি বাবুকে ধরে ধরে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেলুম। বাবু একটু লেংচে লেংচে হাঁটছিলেন। নিজেই কী সব ওষুধ খেলেন, বললেন, পরের দিন ডাক্তারবাবুকে খবর দিলেই চলবে। রাত্তিরে ভাত-টাত কিছু খেতে চাইলেন না। শুয়ে পড়লেন। সকালবেলা উঠে দেখি, বাবু নেই !”

ইরানি জিজ্ঞেস করল, “ঘরের দরজা বন্ধ ছিল ?”

“বাবু তো কোনোদিন দরজা বন্ধ করেন না !

“কেউ জোর করে ধরে নিয়ে গেছে ? পায়ে চোট লেগেছিল, উনি নিজে-নিজে নিশ্চয়ই কোথাও যাবেন না !”

“জোর-জবরদস্তির চিহ্ন তো কোথাও নেই, দিদিমণি ! পাশের ঘরেই কেষ্ট বলে একটা ছেলে শোয়। সেও কোনো শব্দ শোনেনি। তবে মাঝরাতে বাবু বোধহয় একবার নিজেই নেবুবাগানে গিয়েছিলেন।

“লেবুবাগান কোথায় ? কত দূরে ?”

“বাড়ির পাশেই তো। বাবু নানারকম গন্ধনেবুর গাছের বাগান করেছিলেন তো ! পেয়ারাবাগানটা পুড়ে গেল, তারপর থেকে বাবু প্রায়ই নেবুবাগানে গিয়ে বসে থাকতেন।’

“জ্যাঠামশাই যে রাত্তিরে লেবুবাগানে গিয়েছিলেন, তা কী করে বোঝা গেল ?”

“রাত্তিরবেলা বেরুলে বাবু সাধারণত একখানা লাঠি আর টর্চ নিয়ে বেরুতেন। নেবুবাগানের মাঝখানটায় বাবুর লাঠিখানা পড়ে ছিল।”

সাইকেল - ভ্যানওয়ালা বলল, “ও মধুদাদা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি ! তোমার বাবুর তো একখানা বেশ ভাল সাইকেল ছিল। সেটাও চুরি গিয়েছে শুনছি ?”

মধু বলল, “সেটা চুরি গিয়েছে বাবু চলে যাবার দু’দিন আগে। থানায় খবর দেওয়া হয়েছিল।”

ইরানি হাতব্যাগ খুলে পাঁচ টাকার একটা নোট বার করে ভ্যানওয়ালাকে বলল, “এই নিন। আপনাকে আর আসতে হবে না। বাকিটা পথ আমরা হেঁটেই যাব।”

ভ্যানওয়ালা জিভ কেটে বলল, “না, না গো, দিদি, এইটুকুনি পথ এগিয়ে দিয়েছি, এজন্য আবার টাকা নেব কী ! তোমরা আমাদের গাঁয়ে এয়েছ। রামবাবু বড় ভাল লোক ছিলেন। গরিব মানুষদের কত উপকার করতেন। আহা, এমন মানুষটা....”

সাইকেল-ভ্যানওয়ালাকে বিদায় দিয়ে ওরা হেঁটে হেঁটে কথা বলতে বলতে এগোতে লাগল। এখন জোড়া-তালগাছ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ইরানিই মধুর সঙ্গে কথা বলছে বেশি। দিপু ঠিক মন দিতে পারছে না। সে মাঝে-মাঝে চোখ বুজে একটা কিছু দেখবার চেষ্টা করছে।

রাত্তিরবেলা জ্যাঠামশাই একটা লাঠি আর টর্চ নিয়ে লেবুবাগানে গিয়েছিলেন। কেন ?

দিপু যেন স্পষ্ট দেখতে পেল জ্যাঠামশাইকে। আকাশে মেঘ, একটুও জ্যোৎস্না নেই। অন্ধকার লেবুবাগানের মধ্যে জ্যাঠামশাই টর্চ জ্বেলে ব্যস্ত হয়ে কী যেন খুঁজছেন। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তিনি হাঁটছেন আর টর্চের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছেন চারদিকে। কী খুঁজছেন তিনি ?

(ক্রমশ)

ছবি : অনুপ রায়

ডাক

আলোক সরকার

কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল। প্রথমটায় একটু রাগই হয়েছিল, দুঃখও—এতদিনের বন্ধ-থাকা ধুলো-জমা ঘরটা আমার থাকার জন্যে ব্যবস্থা হল, এত বড় বাড়িতে আর ঘর ছিল না! অবশ্য দুজন লোক মিলে ধুলোটুলো ভাল করেই পরিষ্কার করেছিল, বিছানায় পাতা হয়েছিল ধপধপে নতুন চাদর, এমনকী ঘরের কোণের দিকে টেবিলের রুপোর ফুলদানিতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধার ব্যবস্থা করতেও ভোলেননি হিমাদ্রিবাবু। আমার বন্ধু হিমাদ্রিবাবু। এক-সময়ের আপিসের সহকর্মী। সে-আপিস আমিও ছেড়ে দিয়েছি, উনিও ছেড়ে দিয়েছেন, তবু চিঠিতে যোগাযোগ প্রায় নিয়মিতই থেকে গিয়েছে, আর বছরে দু'একবার দেখা-সাক্ষাৎও যে হয় না এমন নয়। হিমাদ্রিবাবু প্রায়ই বলতেন তাঁদের বাড়িতে একবার যেতে। বীরভূমের আধা-শহরের এক বাড়ি, যেখানে হিমাদ্রিবাবুরও বছরে দু'চারবারের বেশি যাওয়া হয়ে ওঠে না। বাড়িটা বেশ বড়, আর নিয়মিত দেখাশোনা করার লোক থাকাতে সারা বছরই বেশ ঝকঝকে থাকে। যাব-যাব করেও আর কিছুতেই হিমাদ্রিবাবুর বাড়িতে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। এতদিন পরে সুযোগ হল।

বলা বাহুল্য, হিমাদ্রিবাবুও এসেছেন। হাওড়া থেকে দুজনে ট্রেনে উঠেছি, সারা পথের অনেক কথার মধ্যে বেশির ভাগ কথাই হয়েছে ওই বাড়ি নিয়ে। হিমাদ্রিবাবুই বলেছেন। বাড়িটাকে কতদিন আর এমনি ফেলে রাখা যায়, ফেলে রেখে লাভই বা কী! অন্তত একটা অংশ ভাড়া দিলে কিছু টাকা আসে ইত্যাদি। আমি ওসব কথায় তেমন কান

দিইনি। বৈশাখ মাসের দিন। ট্রেনের জানলা দিয়ে শূন্য খাঁখাঁ-করা মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকতেই আমার বেশি ভাল লাগছিল। একটা গুমরে-ওঠা নিস্তব্ধতায় কেমন যেন ভয়-ভয়ও করছিল আমার। ট্রেনের শব্দ, হিমাদ্রিবাবুর একটানা বকুনি, সব সেই নিস্তব্ধতার ভিতর মিলে-মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছিল।

দুপুরের শেষ দিকে হিমাদ্রিবাবুর বাড়িতে পৌঁছনো গেল। গরমে কষ্ট হচ্ছিল, তবু বিশ্রাম নেবার কথা ভাবলাম না। হিমাদ্রিবাবুদের বাড়িটা বেশ বড়, বয়সও কম নয়। এই ধরনের প্রাচীন বড় বাড়ি দেখলেই আমার ঘুরে-ঘুরে দেখতে ইচ্ছে হয়। সারা বিকেল, সন্ধে হবার আগে পর্যন্ত বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখলুম। দোতলা বাড়ি, ঘরের সংখ্যা তা প্রায় পনরো-ষোল হবে, আর সব ঘরই বেশ সাজানোগুছনো। নিজের জন্য নির্দিষ্ট ধুলো-জমা অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরটা দেখে তাই যদি একটু রাগ একটু দুঃখ হয়েই থাকে, অন্যায় বলা চলবে না।

কিন্তু রাত্তিরে শুতে এসে দক্ষিণের জানালাটা খুলে দিতেই মন থেকে সব রাগ সব দুঃখ কোথায় উবে গেল। নিঃসন্দেহে বাড়ির মধ্যে এটাই সবচেয়ে ভাল ঘর। দোতলা ঘরের দক্ষিণের দিকে বড়-বড় দুটো জানলা, জানলার ওপাশে বড়-বড় দুটো গাছ। একটা কৃষ্ণচূড়া, অন্যটা গুলমোহর। বৈশাখ মাসে টকটকে লাল ফুলে ভরে রয়েছে কৃষ্ণচূড়া, কোথাও একটা সবুজ পাতাও দেখা যাচ্ছে না, গাছটা যেন নিজের সারা শরীরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। ঠিক তেমনি গুলমোহর, হলুদ হলুদ, সেই হলুদকেও হলুদ আগুন বললে ভুল হবে না। দৃশ্যটা যেমন সুন্দর, ঠিক তেমনি কোথায় যেন একটা বড় রকমের ভয়-ভয়। সেই ভয়-ভয়টাকে আমার অবশ্য এক ধরনের রোমাঞ্চ বলেই মনে হচ্ছিল, এমন একটা ঘরে থাকতে পারা একটা ভাগ্য বলেই মনে হচ্ছিল আমার।

অনেকক্ষণ জানলার পাশে দাঁড়িয়ে থাকলাম। বাইরে জ্যোৎস্না হয়েছে খুব। সারাদিনের পরিশ্রম, তার ওপর ভারী খাওয়া-দাওয়া, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল। তবু জানলার কাছ থেকে সরে যেতে ইচ্ছে করছিল না। হাওয়া দিয়েছিল খুব, হাওয়ায় দুলে উঠছিল কৃষ্ণচূড়া, দুলে উঠছিল গুলমোহর আর আমার কেমন যেন মনে হচ্ছিল দুটো গাছই দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে ডাকছে। খুব নিবিড় আর ভালবাসা-মাখানো ডাক। আমার খুব ইচ্ছে করছিল গাছ দুটোর কাছে যেতে, হাত দিয়ে অন্তত একবার স্পর্শ করতে। জানলার গরাদে আমি অজান্তে একবার হাত রাখলুম। মনে হল ইচ্ছে করলেই আমি লোহার গরাদগুলো বাঁকিয়ে ফেলতে পারি।

জানলার পাশে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলুম খেয়াল নেই। গরাদগুলো বাঁকিয়ে প্রায় জানলার কাছে এসে-পড়া কৃষ্ণচূড়ার ডাল যে ধরিনি, তার কারণ বোধহয় পরের বাড়ির গরাদ ভাঙাটা ঠিক কাজ হবে না মনে করেই। কখন একসময় বিছানায় গিয়ে শুয়েছিলুম নিশ্চয়। ঘুম যখন ভেঙেছিল, তখন বেশ সকাল।

ঘুম থেকে উঠে গাছদুটোর কথা তেমন কিছু মনেই পড়েনি। হাতমুখ ধুয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে জানলার কাছে যে গিয়েছিলুম তারও কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু জানলা দিয়ে বাইরে চাইতেই ভীষণ চমকে উঠলুম। সামনে কোনো গাছ নেই তো। মোটামুটি চওড়া একটা পথ,

পিচ-বাঁধানো। সেখান দিয়ে লোকজন যাচ্ছে, দু-একটা সাইকেল-রিকশা। ঠিক উল্টোদিকে একটা মুড়ি-বাতাসার দোকান, তার পাশেই একটা খাবারের দোকানে বড় কড়ায় জিলিপি ভাজা হচ্ছে।

গাছ দুটো গেল কোথায়!

এ নিয়ে হিমাদ্রিবাবুকে আমি কোনো প্রশ্ন করলুম না। বোঝাই যাচ্ছে সবটাই স্বপ্ন, ঘুমের ঘোরে কী দেখতে কী দেখেছি। আমি আর ও নিয়ে মাথা ঘামালুম না। একটু বেলা হলে ওই পথ ধরেই হিমাদ্রিবাবুর সঙ্গে বেড়াতে বেরলুম। পথটা গিয়ে যেখানে থেমেছে, সেখানে তিন-চারটে বড়-বড় কারখানা। লোকজনের বেশ ভিড়। ফেরার সময় দেখলুম দলে দলে লোক ওই পথ ধরে চলেছে কারখানার কাজে যোগ দেবে বলে।

হিমাদ্রিবাবু জানালেন, বছর দশেক হল এ-অঞ্চলে এই কারখানাগুলো বসেছে। লোকজনের আসা-যাওয়ার সুবিধের জন্যে বনজঙ্গল কেটে এই পথটা তৈরি হয়েছে তাও সাত-আট বছর হল।

সেদিন সন্ধ্যার দিকে ঝড় উঠেছিল। ঝড় থামার পর বেশ কিছুক্ষণ ধরে বৃষ্টি। রাতে যখন শুতে গেলুম, তখনও হাওয়ায় বেশ জোর, ঘরে ঢুকে দেখি বন্ধ জানলা দুটো যেন ফুঁসে উঠছে, থরথর করে কাঁপছে। আমি ভাবলুম জানলা দুটো খুলেই দিই, কিন্তু ভয় হল হাওয়ার ধাক্কায় হ্যারিকেনটা নিভে যাবে। অন্ধকারে থাকতে আমার একেবারে ভাল লাগে না। হিমাদ্রিবাবুর বাড়িতে ইলেকট্রিক আলোর কোনো ব্যবস্থা নেই ; হিমাদ্রিবাবু বলেন, কেউই তো নিয়মিত থাকে না, তাই তেমন কোনো গরজ হয়নি কারো।

যাই হোক, ঝড়বৃষ্টির জন্য রাতটা ভারী ঠাণ্ডা হয়েছিল। হ্যারিকেনের শিখাটাকে একটু কমিয়ে ঘরের কোণে রেখে শুতে-না-শুতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঘুম যখন ভাঙল তখন মাঝরাত। ভীষণ গরম লাগছে। দরজা জানলা বন্ধ করা ঘরে হাঁফ ধরছে যেন। বাইরে হাওয়ার জোরও আর তেমন নেই। জানলা দুটো শান্ত। আমি বিছানা থেকে উঠে দুটো জানলাই ভাল করে খুলে দিলুম। জানলার সামনে সেই দুটো গাছ!

বৃষ্টি-থেমে-যাওয়া ভিজে জ্যোৎস্নার মধ্যে লাল কৃষ্ণচূড়া আর হলুদ গুলমোহর। অল্প হাওয়ায় মৃদু-মৃদু দুলছে। আমার তেমন কিছু অবাকও লাগল না, যেন গাছ দুটোর ওখানে থাকারই কথা ছিল। ঠিক কালকের মতো মৃদু হাওয়ায় দুলে-দুলে গাছদুটো আমাকে ডাক দিল, খুব নিবিড় আর ভালবাসামাখানো ডাক। আমি জানলার গরাদের উপর হাত রাখলুম, আমার খুব ইচ্ছে করল গাছদুটোর কাছে যাই। লোহার গরাদ, তা-ও কত নরম। আমি একটু চাপ দিলুম, আমি আরো জোরে চাপ দিলুম। গরাদ দুটো কত সহজে বেঁকে যাচ্ছে। ভিজে জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে গাছদুটো, লাল কৃষ্ণচূড়া আর গুলমোহর ফুলের গাছ। ওরা যেন হেসে উঠছে, ওরা যেন হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিচ্ছে আমাকে, জানলার গরাদে আমি আরো আরো জোরে চাপ দিলুম। ওরা আমাকে ডাকছে, কত নিবিড় আর ভালবাসামাখানো ডাক, আরো আরো জোরে জানলার গরাদে চাপ দিলুম আমি।

গাছ দুটো আনন্দে খিলখিল করে হেসে উঠছে!

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

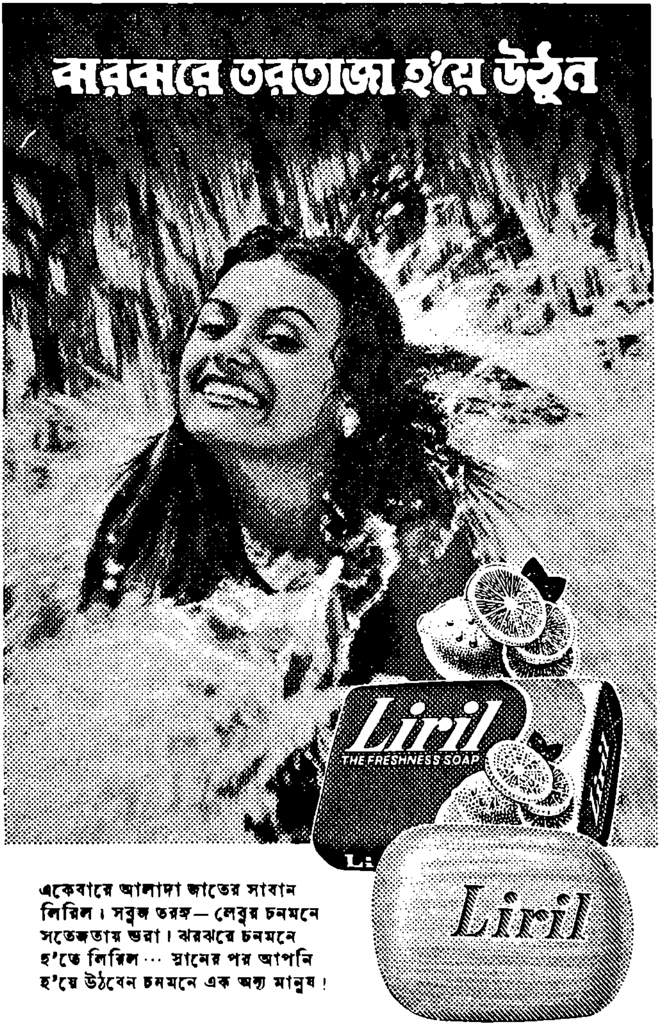

একেবারে আলাদা জাতের সাবান
লিরিল। সবুজ তরঙ্গ— লেবুর চনমনে
সতেজতায় ভরা। ঝরঝরে চনমনে
হ'তে লিরিল ··· স্নানের পর আপনি
হ'য়ে উঠবেন চনমনে এক অন্য মানুষ!

লিরিল
তরতাজা হবার সাবান

লেবুর মত চনমনে তরতাজা

লিনটাস - LR.27.1810

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

বিধাননগর সরকারি স্কুলের প্রধানশিক্ষক কী বলেন

কলকাতার পুব দিকে সম্প্রতি গড়ে উঠেছে এক ছিমছাম আধুনিক উপনগরী—সল্ট লেক সিটি। আরেক নাম বিধাননগর। বিধাননগর গভর্নমেণ্ট স্কুলটি সরকারি বিদ্যালয়গুলির মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। এর সূচনা ১৯৭৭ সালের ১৮ এপ্রিল। বিদ্যালয়টি সহ-শিক্ষামূলক এবং উচ্চমাধ্যমিক। এখান থেকে ছাত্রছাত্রীরা প্রথম মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয় ১৯৮০ সালে ও প্রথম উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেয় ১৯৮১ সালে। প্রথম বছরেই মাধ্যমিক পরীক্ষায় এই বিদ্যালয়ের ছাত্র বিংশতিতম স্থান অধিকার করে। ওই বিদ্যালয় থেকেই সে ১৯৮২ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অষ্টম স্থান অধিকার করেছে। ১৯৮৩ সালে এই বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ৪৬ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৩৭ জন উত্তীর্ণ হয়েছে প্রথম বিভাগে এবং ৯ জন দ্বিতীয় বিভাগে।

বর্তমান প্রধানশিক্ষক ডঃ মুরারিমোহন ভট্টাচার্য। প্রধানশিক্ষকের বিষয় গণিত। *কীভাবে পড়াশোনা করলে পরীক্ষায় ভাল ফল করা যায়,* এই জিজ্ঞাসার জবাবে ডঃ ভট্টাচার্য জানালেন, "প্রথমেই মনে রাখতে হবে, পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষর, বানান ভুল না-করা এবং দ্রুতগতিতে 'টু দ্য পয়েন্ট' উত্তর লেখার উপরেই ভাল নম্বর নির্ভর করে। বিভিন্ন বিষয়ের স্কুলপাঠ্য বইগুলো ভাল করে আগাগোড়া পড়তে হবে। সহায়ক পুস্তক হিসেবে যে-সব বইয়ের কথা শিক্ষকরা বলবেন, প্রয়োজনবোধে সেগুলো থেকে সাহায্য নিতে কখনোই ভুলবে না।"

"ইংরেজি ও বাংলা কীভাবে পড়লে ভাল হয়?" এই প্রশ্নের উত্তরে বললেন "ইংরেজি বা বাংলা পড়ার সময় পাঠ্য গদ্য ও পদ্যগুলো বারবার পড়ে মনে রাখতে হবে, যাতে কোনো লাইন তুলে প্রশ্ন দিলে

সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারা যায় যে, কোথা থেকে এসেছে। ইংরেজি প্রশ্নোত্তর লেখার সময় সংযমী হতে হবে। নির্দিষ্ট বাক্যসীমার মধ্যে উত্তর দেওয়া চাই। ব্যাকরণাংশ ভাল ইংরেজি গ্রামার বই থেকে শিখে নিয়ে তারপর টেস্টপেপার সমাধান করতে হবে। ইংরেজি লেখার সময় খুব শক্ত-শক্ত দুর্বোধ শব্দ বা শক্ত ইডিয়মস্ ব্যবহার না করাই ভাল। নির্দিষ্ট পাঠ্য বইয়ের বাইরেও কিছু কিছু ইংরেজি বই পড়া ভাল, এবং ইংরেজি সংবাদপত্র নিত্য পড়ার অভ্যাস করা খুবই দরকার।

"বাংলা পড়ার সময় বানানের দিকে ও ভাষার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। অনেকের ধারণা, বাংলা তো মাতৃভাষা, তাই অল্প পড়লেই লেখা যাবে। ধারণাটা সর্বৈব ভুল। বাংলা ভাষায় অধিকাংশেরই দক্ষতা কম। তাই নিয়মিত বাংলা পড়া ও লেখার অভ্যাস থাকা চাই।"

আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন : *"অঙ্ক কেমন করে করতে হবে ?"*

"অঙ্কে প্রায় অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীরই ভীতি থাকে। এই ভীতি কাটাবার একটা

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয়

বিধাননগর সরকারি স্কুলে এবার ক্লাস নাইন থেকে টেন-এ ফার্স্ট হয়ে উঠেছে ধ্রুব ভট্টাচার্য। ধ্রুব ক্লাস ফোর থেকে এই স্কুলে পড়ছে। গত দু'বছর ধরেই সে ক্লাসে ফার্স্ট হচ্ছে। এবারে সে শতকরা ৭৯ ভাগ নম্বর পেয়েছে।

মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে ধ্রুব সকালে ২ ঘণ্টা এবং সন্ধ্যায় ৪ ঘণ্টা পড়ে। ছুটির দিন সারা দুপুর অঙ্ক করে। অঙ্ক তার সবচেয়ে প্রিয় বিষয়।

লেখাপড়ার ব্যাপারে ধ্রুব স্কুলের সব শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পায়। বাড়িতে তার বাবা ও কাকা পড়া দেখিয়ে দেন। তার মেসোমশাই পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে বিশেষ সাহায্য করেন। লেখা ও পড়া দুটোই ধ্রুব সমান গুরুত্ব দিয়ে করে। তার ঐচ্ছিক বিষয়ও গণিত। ঐচ্ছিক গণিতে কে সি নাগ এবং মাইতি-মাইতির বই ছাড়াও এন জি দাসের স্ট্যাটিস্টিকাল মেথড্স তার খুব কাজে লাগে। ভবিষ্যতে কী হবে এ-সম্পর্কে

তেমন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত কিছু না নিলেও, নিউক্লিয়র ফিজিক্স নিয়ে পড়ার ইচ্ছা আছে।

গল্পের বই আর ফুটবল খেলা তার প্রিয় নেশা। ফেলুদা পড়তে দারুণ লাগে। আনন্দমেলায় প্রকাশিত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পাহাড়চূড়ায় আতঙ্ক' খুব ভাল লেগেছিল। প্রসাদ-এর 'সহজে ইংরেজি' তার খুব উপকারী মনে হয়।

"অনেকের ধারণা, বাংলা তো মাতৃভাষা, তাই অল্প পড়লেই লেখা যাবে। ধারণাটা সর্বৈব ভুল। নিয়মিত বাংলা পড়া ও লেখার অভ্যাস থাকা চাই।"

প্রধান উপায় হল নিয়মিত অঙ্ক করা। অঙ্কের ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে বড় প্রয়োজন, সেটা হল মনঃসংযোগ। অঙ্কে শুধু নির্ভুল উত্তর বার করাই যথেষ্ট নয়, অঙ্ক কষার পদ্ধতিও নির্ভুল থাকা প্রয়োজন। তা না হলে পুরো নম্বর উঠবে না।"

ভূগোল ও ইতিহাস নিয়েও প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি তাতে বললেন, "বিজ্ঞান ও ভূগোলের ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নভাবে চিত্রাঙ্কন এবং মানচিত্রের ব্যবহার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুমুখী প্রশ্নগুলোর উত্তর সংক্ষিপ্ত এবং প্রশ্নানুগ হওয়া দরকার।

"সব শেষে ইতিহাস। ইতিহাসের লেখার মধ্যেও সাহিত্যগুণ থাকা উচিত। শুধু বই মুখস্থ করলেই হবে না, ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা, সন-তারিখ ইত্যাদি মনে রেখে তথ্যভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করতে হবে।"

"মন দিয়ে পড়ো, ভাল করে লেখো এবং সব পড়া মনে রাখবার জন্য নিয়মিত অনুশীলন করো। শুধু পড়লেই হবে না, ভালবেসে পড়তে হবে।" এই হল তাঁর উপদেশ।

"আনন্দমেলা কেমন লাগে?" উত্তরে তিনি বললেন, পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকে আজও তিনি নিজেই এর আগ্রহী পাঠক।

—অপরাজিতা

দুটি ছড়া

অজিতকৃষ্ণ বসু

মিষ্টি মানুষ

আমের মতো মিষ্টি মানুষ
ল্যাংড়া মধু হালদার,
বাসিন্দা যে মিষ্টি আমের
জন্মভূমি মালদা'র।
রক্তে তাঁহার বেজায় চিনি,
মিষ্টি মোটেই খান না তিনি,
আচার খেতে বাসেন ভাল
খাট্টা এবং ঝালদার।

দুটি প্রশ্ন

ঠুলি-পরা চোখে রে ভাই
কেমন করে ধুলো দেবে?
দু'কান যাহার সমান কালা
কোন্ কানে তার তুলো দেবে?

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

লাটসাহেবের বাড়ি হল

গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি সাহেব তো ঠিক করলেন যে, এভাবে আর চলছে না, লাটসাহেবের নিজের বাড়ি দরকার। কিন্তু কী করে হবে সে বিষয়ে অনেক প্রশ্ন থেকে গেল। বাংলা-বিহার-ওড়িশা প্রায় পঞ্চাশ বছর হল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে এসেছে। দেশে অনেক দুর্বল রাজ্য আছে বটে, কিন্তু তারা তখনও ইংরেজের মুঠোর মধ্যে আসেনি। বড় রাজ্যদের মধ্যে অবশ্য নিজামের কথা বলা যায়। কিন্তু ক্ষমতা বলতে বিশেষ কিছু নেই। গত একশো বছর ধরে নিজাম অনেক যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু প্রায় কোনো যুদ্ধেই জিততে পারেননি। তা ছাড়া অবশ্য পশ্চিমে মারাঠারা রয়েছে, দক্ষিণে টিপু সুলতান। এদের সঙ্গে এক হাত লড়াই হয়ে গিয়েছে। ইংরেজদের তাতে সুবিধেই হয়েছে বলতে হবে। কিন্তু ভবিষ্যতের বড় লড়াই তখনও বাকি। তাতে অনেক টাকা খরচ হবে নিশ্চয়ই। বিলেতে কোম্পানির কর্তারা অর্থাৎ ডিরেক্টররা লড়াই করবার কথা শুনলে খুশি হতেন না। হারলে সর্বনাশ, জিতলে লাভের গুড় পিঁপড়ে খেয়ে যাবে এত খরচ। আর বড় বাড়ি করবার খরচ চাইলেই কি কোম্পানির কর্তাদের কাছে পাওয়া যেত? ওয়েলেসলি অবশ্য অতশত ভাবলেন না। বিলেতের কর্তাদের সব কথা জানাতে হবে, এই চিন্তা তাঁর মনে ঠাঁই পেল না।

বাড়ি করা তো ঠিক হল, কিন্তু কী ধরনের বাড়ি? ভারতবর্ষে তো বিভিন্ন রকমের প্রাসাদ তৈরি হয়ে এসেছে। মোগল সম্রাটরা হিন্দু মুসলমান দু-রকম স্থাপত্যকে মিলিয়ে স্থাপত্যে নতুন চেহারা আনবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের সময়ের আঁকা ছবিতেও এই চেষ্টা ধরা পড়ে। কিন্তু দেশীয় রীতি পছন্দ হল না। কী পছন্দ হল বলছি। লাটসাহেবের বাড়ি তৈরি হবার একশো বছর পরে লর্ড কার্জন এদেশের বড়লাট হয়ে এসেছিলেন। তাঁর ঠাকুরদার ঠাকুরদার সময়ে ইংলণ্ডের ডার্বিশায়ার অঞ্চলে তাঁরা বসতবাড়ি বানিয়েছিলেন। তখনকার একজন বিখ্যাত স্থপতি রবার্ট অ্যাডম্ সাহেব এর প্ল্যান তৈরি করেছিলেন। সেই নকশা অনুসারে সরকারের একজন ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন ওয়াট ও ক্যাপ্টেন টিরেটোকে প্ল্যান তৈরি করতে বলা হল। টিরেটোর তখন খুব নামডাক। এখন কলকাতার টেরিটিবাজার অঞ্চল তাঁরই সম্পত্তি ছিল।

টিরেটোর প্ল্যান শেষপর্যন্ত পছন্দ হল না। কত টাকা লাগবে হিসেব করে দেখা গেল পাঁচ লাখ ঊনত্রিশ হাজার সিক্কা টাকা। সিক্কা টাকার বাজারদর সাধারণ টাকার

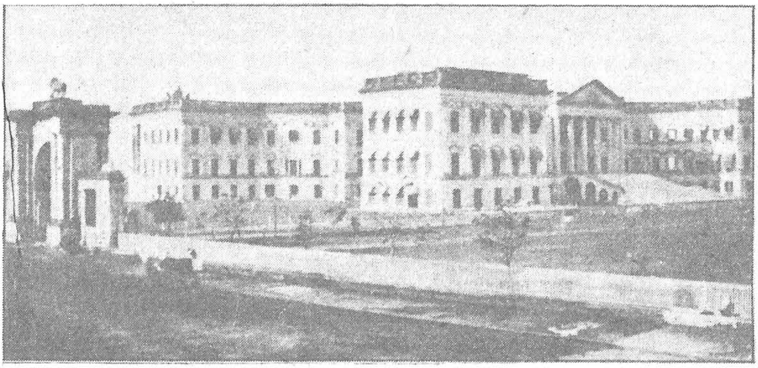

কলকাতার লাটভবন (পুবদিক থেকে)। ভিতরকার গাছপালা তখনও বড় হয়নি

চেয়ে একটু বেশি ছিল। এটা মনে হয় শুধু বাড়ি তৈরির খরচ।

বাড়ির যখন ভিত্তি স্থাপন করা হল, লর্ড ওয়েলেসলি নিজে কিন্তু তখন উপস্থিত থাকতে পারলেন না। দক্ষিণে যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠল। বড়লাট কলকাতা থেকে কুচ আরম্ভ করলেন। টিমথি হিকি নামে একজন ইঞ্জিনিয়ার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। তিনি যে বিখ্যাত লোক ছিলেন তা নয়, তবে তাঁর এক আত্মীয় নামকরা ছবি-আঁকিয়ে ছিলেন। লর্ড ওয়েলেসলিও তাঁকে দিয়ে তাঁর নিজের প্রতিকৃতি আঁকিয়েছিলেন।

১৭৯৮ সালের মে মাসে বাড়ির কাজ আরম্ভ হয়েছিল। ১৮০২ সালের প্রথম দিকে বেশির ভাগ কাজ শেষ হয়ে গেল। ছোটবড় খানার ব্যবস্থা হতে লাগল লাটসাহেবের বাড়িতে। এই যে এত বড় কাণ্ড ঘটে গেল কলকাতায়, সে-খবর বড়লাট প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডের কর্তাদের জানাননি। ওয়েলেসলি বলতেন, তিনি তো দুটি চিঠি লিখেছিলেন। একটি হল ১৭৯৮ সালে, আর একটির তারিখ এপ্রিল ১৮০১। তাতে সব জিনিস পরিষ্কার করে বলা হয়েছিল। তা ঠিক নয়, কাগজপত্র ঠিকমতন কি পাঠানো হয়েছিল? সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বিলেতে খোঁজ করে সে-ধরনের কোনো চিঠির হদিস পাওয়া যায়নি। ওয়েলেসলি অবশ্য জানিয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষ এমন পোড়া দেশ যে, এখানে পুরনো বাড়ি মেরামত করার চেয়ে নতুন বাড়ি তৈরি করার খরচ কম। পরে অবশ্য দেখা গেল খরচ অনেক বেশি পড়েছে। বাড়ি তৈরি করতে সাত লাখ টাকার উপর, আশেপাশের জমি ও বাড়ি কিনতে আরও পাঁচ লাখ একাত্তর টাকা, আর নতুন নতুন রাস্তা বানাতে সাতাশ হাজার টাকা খরচ পড়েছে। সবসুদ্ধ ১৩,০১,২৮৬ সিক্কা টাকা। অনুমতিও চাওয়া হয়নি, এবং বাড়ি যে আরম্ভ হয়েছে সে-কথাও জানানো হয়নি। বরং কার্জন পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন, যে মোটা বাঁধানো খাতায় এই সব চিঠি থাকলেও থাকতে পারত, তার পাতা কে যেন ছুরি দিয়ে কেটে নিয়েছে, এইসব থেকে আসল ব্যাপার বুঝতে কি কারুর বাকি থাকে!

একটি কথা মনে হতে পারে।

কলকাতায় বড়লাটসাহেবের বাড়ি তৈরি হচ্ছে একথা লণ্ডনে ঘুণাক্ষরেও কি কেউ জানত না ? বিশ্বাস করা কঠিন। তখন ইউরোপের সঙ্গে চিঠিপত্র যাতায়াতে অনেক সময় নিত। ছ' সাত মাস তো বটেই, কখনও কখনও বছর পেরিয়ে যেত। সেজন্য সাহেব-বিবিরা দেশে খুব বড়-বড় চিঠি লিখতেন। তাতে সবরকম খবর থাকত। পাশের বাড়ির মেমসাহেব ইউরোপ থেকে কীরকম নতুন ফ্যাশানের গাউন আনিয়েছেন, ও বাড়ির বাবুর্চি গেল মাসে পার্টির দিন কী রকম ভাল হাঁসের রোস্ট করেছিল, এইসব কথা। তাঁরা কি কেউই গল্প করেননি যে, কলকাতায় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে। বড়লাটসাহেবের বাড়ি ? ইংলণ্ডের লোকেরা বিলেতে বসেই এদেশ সম্পর্কে অনেক খবর পেতেন। তাঁরা কি এ খবর কখনও শোনেননি ?

এই প্রশ্নের উত্তর কার্জন নিজেই দেবার চেষ্টা করেছেন। ভাসাভাসা খবর সম্ভবত বিলাতে পৌঁছেছিল, কিন্তু কী করা যেতে পারত। প্রত্যেক জাহাজেই ওয়েলেসলির যুদ্ধজয়ের খবর আসছে, আর শোনা যাচ্ছে কীভাবে ক্রমাগত তিনি কোম্পানির রাজত্বের সীমা বাড়িয়ে চলেছেন। ডিরেক্টররা যাই মনে করুন না কেন, এই গভর্নর জেনারেল যদিও অবাধ্য, তবু তাঁকে প্রথমে ঘাঁটাতে সাহস পেলেন না। তাঁর বিরুদ্ধে কিছু করলে দেশের লোক কি খুশি হত ? তখন বিলেতের উইলিয়ম পিট এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতারাও তাঁর বন্ধু। তাছাড়া এ-কথাও প্রমাণ করা শক্ত হত যে, বিলেতের বড়কর্তারা আদপেই কিছু জানতেন না। ডিরেক্টরদের কিল খেয়ে কিল চুরি করার মতো অবস্থা হল। তাঁরা শেষ পর্যন্ত একটি বড় চিঠিতে গভর্নর জেনারেল কী কী অবাধ্যতা করেছেন তার ফিরিস্তি লিখে পাঠালেন। সবাই যে ওয়েলেসলির ব্যবহারে খুশি ছিলেন তা নয়, কিন্তু মোটের উপর ওয়েলেসলির দিকেই পাল্লা ভারী ছিল।

লাটপ্রাসাদের যেদিন ঘটা করে দ্বার উন্মোচন হল, সেদিন লর্ড জর্জ ভ্যালেনসিয়া নামে একজন ভ্রমণকারী কলকাতায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে লিখেছেন, লাটসাহেবের বাড়ি তৈরি করতে অনেক খরচ হয়েছে তো কী হয়েছে ? বড়লাটবাহাদুর কি কুঁড়েঘরে থাকবেন ? মোগলরা যে ভারতবর্ষে এত খরচ করে বাড়িঘর করেছিল, ঠিক করেছিল। আসল কথা, বিলেতে ডিরেক্টররা ব্যবসায়ী ছাড়া কিছু নয়, তারা শুধু মসলিন কাপড় মাপতে জানে আর জিনিস ওজন করতে জানে, এসবের কদর বুঝবার ক্ষমতা তাদের নেই।

যে যাই বলুন না কেন, তখন অনেক ইংরেজও এই কথা ভাবতেন। যে গভর্নর জেনারেল কোম্পানির শত্রুদের অল্প কয়েক বছরের মধ্যে শেষ করে দিলেন, তাঁকে 'কেন তিনি বাড়িঘর তৈরি করতে এত খরচ করেছেন', 'কেন তিনি আগে অনুমতি নেননি', এই সব প্রশ্ন করা কি মানায় ?

দাও রং !

শ্রীপ্রীতিভূষণ চাকী আমাদের জানাচ্ছেন যে, ৮ ফেব্রুয়ারির 'আনন্দমেলা'য় 'দাও রং' নামে যে ছড়া ছাপা হয়েছে, সেটি শ্রীপ্রসেনজিৎ গুহঠাকুরতার লেখা নয়, শ্রীচাকীর লেখা। বস্তুত, শ্রীচাকীর এই ছড়া গত ডিসেম্বর মাসেই পত্রান্তরে প্রকাশিত হয়েছে।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়
উয়েফা কাপের তৃতীয় রাউণ্ডে হেকলাভিক বনাম রোভার্স। ফলাফল এখন ১-১। রয় গোল শোধ করেছে।
রয়! রয়! রয়!
রোভার্স … ১
হেকলাভিক … ১
রোভার্স এখন এগিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর …
দ্যাখো রয় দারুণ বল ঠেলেছে!
রোভার্স জিতবেই!
ডান দিক দিয়ে বল বাড়িয়েছে!
জিমি ফাঁকা!
হেড করলেই রয় বল পাবে!
কিন্তু …
জিমি গোলে বল পাঠাল!
তাই গোল হল না!
হাফ-টাইমের বাঁশি বাজল!
জিমি কি রেগে আছে নাকি?
অতি স্বার্থপরের মতো খেলছে!
ওহে জিমি, বসে পড়ো!
দাঁড়াও, জিমি!
রয়, তুমিও কি ভাবছ যে, আমি রেগে আছি?
PLAYERS
আসলে আমি ভেবেছিলুম যে, আমি হেড করলেই গোল হবে!

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ভুতুড়ে বাড়ি
চা, কফি
যাব্বাবা, আমাদের বাড়ির সামনে দেখছি দিব্যি বাজার বসে গেছে !
কিন্তু বাড়িটা ভুতুড়ে নয়
তার মানে ?
মানে, আমি একবার ক্যালকুলাসের ল্যাবরেটরিতে ঢুকতে চাই । চাবি আছে ?
তা আছে, কিন্তু ...
দ্যাখো ক্যাপ্টেন, ক্যালকুলাস এখান থেকে বিদায় নেবার পরে যে আর কাচ ভাঙেনি, সেটা খেয়াল করেছ ?
তুমি কি বলতে চাও, কাচ ভাঙার মূলে রয়েছে ক্যালকুলাস ?
এসো, ল্যাবরেটরিতে ঢোকা যাক ।
কিসের গন্ধ ?
?

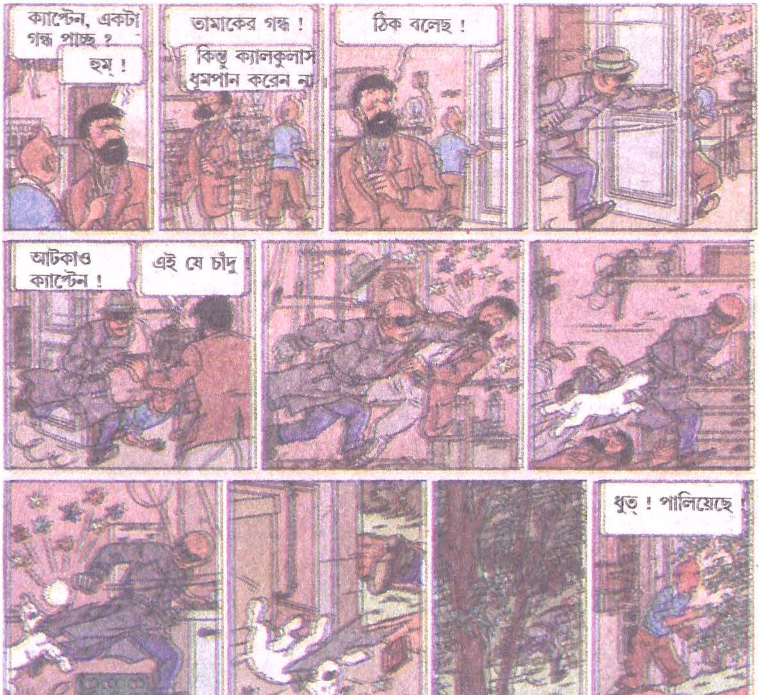

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

একটি সম্পূর্ণ পুষ্টিকর শিশু
আহারে থাকা উচিত
ঠিক ঠিক পরিমাণে
সব কটি পুষ্টিকর উপাদান...

প্রোটিন
শরীর গঠনের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়।
কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট
প্রাণচঞ্চল শক্তির জন্য।
ভিটামিন 'এ'
চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টির জন্য।
ভিটামিন 'বি' গ্রুপ
অন্যান্য যাবতীয় পুষ্টিকর উপাদান
উপযুক্তভাবে গ্রহণের জন্য।
ভিটামিন 'সি'
রোগ প্রতিরোধের স্বাভাবিক ক্ষমতা গড়ে তুলতে।
ভিটামিন 'ডি'
ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস গায়ে লাগতে সাহায্য করে।
আয়রণ
সুস্থ রক্তের জন্য।
ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস
মজবুত হাড় ও সুস্থ সবল দাঁতের জন্য।

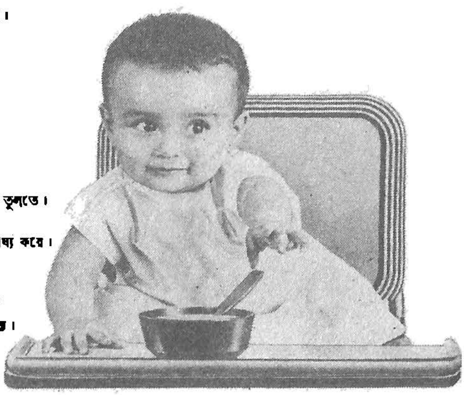

সেরেল্যাক একটি
পুষ্টিকর সম্পূর্ণ শিশু আহার-
যা অত্যন্ত সুস্বাদু।

SAA/FSL/C/3151 BEN

সেরেল্যাকে, প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট, মিনারেল ও ভিটামিন—এই পাঁচটি পুষ্টিকর উপাদানই আছে। প্রতিবারই আপনার বাচ্চাকে সেরেল্যাক খাওয়ানোর সংগে সংগে আপনি নিশ্চিন্ত যে তাকে আপনি সব কটি পুষ্টিকর উপাদানই সঠিক পরিমাণে দিচ্ছেন।

সব কটি পুষ্টিকর উপাদানই সমান প্রয়োজনীয়। কারণ সবগুলি এক সংগে কাজ করে। আর তাই আপনার বাচ্চার সুস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন এমন একটি সিরিয়েল আহারের যা সব কটি পুষ্টিগুণে "সম্পূর্ণ"। প্রত্যেকবার সেরেল্যাক খাওয়ানোর সংগে সংগে আপনার বাচ্চার সারা দিনের পুষ্টি—চাহিদার চার ভাগের একভাগ পূরণ হয়ে যাচ্ছে। পুষ্টির জন্য আপনাকে আর বাড়তি কিছু মেশাতে হবে না।

বুকের দুধই আপনার সন্তানের পক্ষে সবচেয়ে ভাল। কিন্তু তার চার মাস বয়সে যখন শক্ত খাবার তাকে দেওয়া দরকার তখন ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সেরেল্যাক খাওয়াতে আরম্ভ করুন।

সেরেল্যাক®

এতে দুধ মেশানো আছে।

সেরেল্যাক তৈরী করে নেওয়া কি সোজা! শুধুমাত্র আগে ফোটানো কুসুম-গরম জল ঢালুন! মিশিয়ে নিন, নাড়ুন আর খেতে দিন।

বিনামূল্যে সেরেল্যাক শিশুর গ্রোথ চার্ট

এতে আছে, ওজনের চার্ট, রোগ-প্রতিরোধের রেকর্ড, শক্ত খাবার ধরাবার উপায় এবং আরো কত কি……

আপনার কপি পাঠাতে নীচের ঠিকানায় লিখুন:
সেরেল্যাক
পোষ্ট ব্যাগ নং 3 নিউ দিল্লি-110008

NESTLÉ.

জিজাবাইয়ের ঘর । জিজাবাই খাবারের থালা সাজিয়ে বসে আছেন···
এসো
আয় সদাশিব

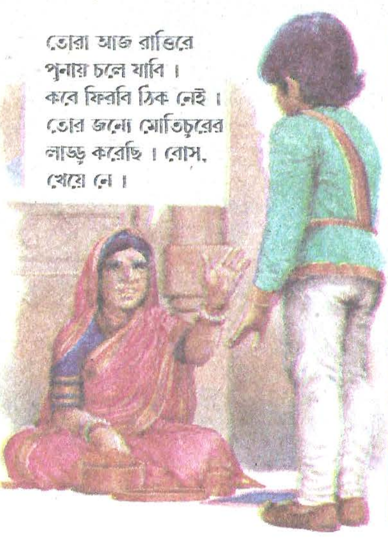
তোরা আজ রাত্তিরে পুনায় চলে যাবি । কবে ফিরবি ঠিক নেই । তোর জন্যে মোতিচুরের লাড্ডু করেছি । বোস, খেয়ে নে ।

সদাশিব গুটি গুটি খেতে বসে । দাসী চলে যায় ।···

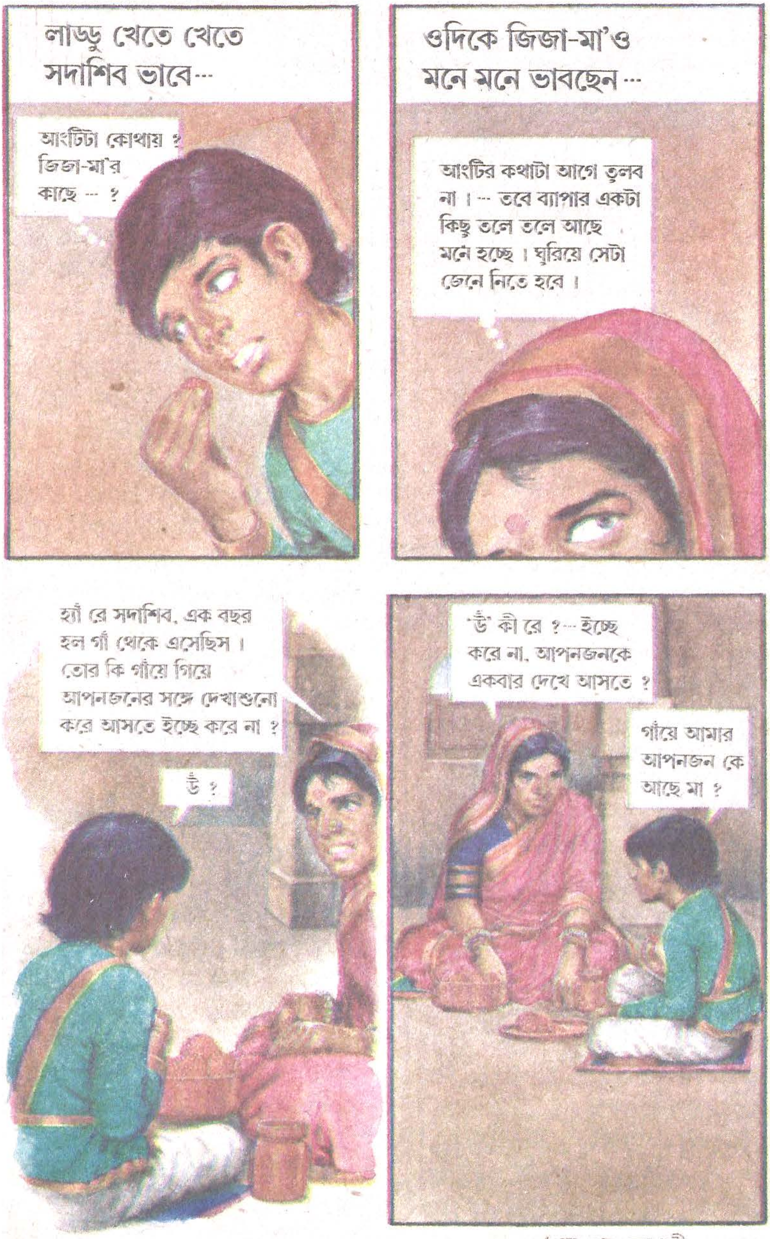

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাস

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

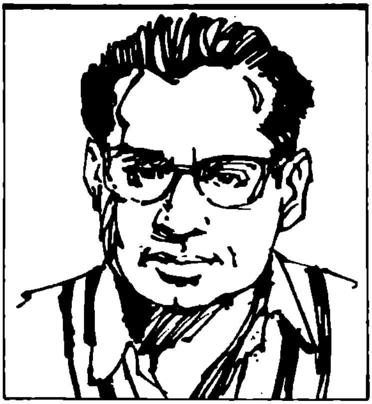

ব্যাটে-বলে

পঙ্কজ রায়

॥ ১৭ ॥

গিলক্রিস্ট পোস্ট-অফিসে গিয়েছিল। হয়তো চিঠিপত্র ফেলবার বা কিছু কিনবার প্রয়োজন ছিল। সেখানে সাধারণ একজন মানুষের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তর্ক শুরু হয়ে যায়। রয় গিলক্রিস্ট যদি ঠাণ্ডা মাথার মানুষ হত তবে, তর্ক করা দূরে থাক, দু চারটে কথা বলেই সরে আসত। কখনো কথা-কাটাকাটির মধ্যে যেত না। কিন্তু ব্যাপারটা শুধু বাদবিতণ্ডার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না। বদরাগী গিলক্রিস্ট একটুতে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। এক্ষেত্রেও ধৈর্যহারা হয়ে হাত চালিয়ে দিল। লোকজনই বা ছাড়বে কেন ? ফলে একটা বিতিকিচ্ছিরি অবস্থার সৃষ্টি হল। থানা-পুলিশ হয়-হয়। এর মাঝে কিছু লোক বুদ্ধি করে গিলক্রিস্টকে সরিয়ে নিয়ে গেল। নইলে সেদিন লোকটা আরও মারধর তো খেতই, পুলিশের হাতেও ধরা পড়ত। দুর্দশার অন্ত থাকত না।

কানপুরে যে দুই দলে খেলা হয়েছিল, তার একটি ছিল মুখ্যমন্ত্রীর একাদশ। অন্যটি রাজ্যপালের একাদশ, এক দলের অধিনায়ক ছিল পলি উম্রিগড়। অন্য দিকে কে যে অধিনায়কত্ব করেছিলেন মনে করতে পারছি না। বোধহয় পতৌদির নবাব। যাই হোক, আমি ছিলাম উম্রিগড়ের বিরুদ্ধ দলে। খেলার শুরুতে একটা ভারী মজার ঘটনা ঘটেছিল। টস করেছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যপাল। যথাসময়ে 'নন-প্লেয়িং ক্যাপ্টেন' দুজন মাঠে চলে গেলেন। ফোটোগ্রাফাররা ভিড় করে দাঁড়াল তাঁদের ঘিরে। অভাবনীয় দৃশ্য তো। তাঁরা করমর্দন করলেন। তারপর মুখ্যমন্ত্রী মুদ্রা ছুঁড়ে দিলেন আকাশে। মাঠের হাল্কা মেজাজ বজায় রাখতেই বোধহয়, মুদ্রা আকাশ থেকে নেমে এল স্বল্পকেশ রাজ্যপালের মাথায়।

হেসে উঠল সকলে। রাজ্যপাল মুদ্রার এই অস্বাভাবিক অবস্থিতিকে মোটেই পছন্দ করছিলেন না। ওদিকে মুখ্যমন্ত্রী তাড়া দিচ্ছেন। "কী হল, বলুন, হেড না টেল ?"

মহা-যন্ত্রণা ! রাজ্যপাল বলেন কী করে ? মুদ্রা তো তাঁর মাথায়। মাথা ঝাঁকিয়ে অবিলম্বে সেটাকে মাটিতে ফেলে দিলেন। তারপর সেটা একঝলক দেখে নিয়ে ঝট্ করে বলে ফেললেন, "হেড।"

মাঠসুদ্ধ লোক তখন হাসছে।

টসে জিতে রাজ্যপালের একাদশ আমাদের ব্যাট করতে দিল। উম্রিগড় প্রথমে ব্যাট করতে চেয়েছিলেন। গিলক্রিস্ট নারাজ। সে পিচ দেখে ঘুরে এসে খুব উল্লসিত। "পলি, পিচ কেমন দেখলে ?"

"মন্দ নয়।"

"স্বর্গ, একেবারে স্বর্গ। গ্রিন-টপ উইকেট। ওদের তিষ্ঠোতে দেব না। ফিল্ডিং নিও, যদি আমরা টসে জিতি।"

গিলক্রিস্টের কথাকে মূল্য দিলেন উম্রিগড়। মুখ্যমন্ত্রীর একাদশকে আহ্বান জানালেন ব্যাট করবার জন্য।

এই খেলায় এক ওভারে আটটা বল দেওয়া হবে ঠিক করা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর একাদশের পক্ষে আমি ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে যাইনি। তিন নম্বরে অর্থাৎ ওয়ান ডাউনে পাঠানো হয়েছিল আমাকে। গিলক্রিস্টের হাতেই প্রথম উইকেটের পতনের পর, ক্রিজে গিয়ে দাঁড়ালাম।

কিন্তু প্রথমেই যে বাজে ব্যাপারের মুখোমুখি হতে হবে সে-কথা ভাবতে পারিনি। আমি ক্রিজে গিয়ে দাঁড়াতেই সে একবার আড়চোখে তাকিয়ে হাসল। তারপর দৌড়ে এসে প্রথমে যে বলটা দিল, সেটা মারাত্মক বাউন্সার। অবাক ব্যাপার! কী খেলা হচ্ছে এখানে, টেস্ট ক্রিকেট না প্রদর্শনী খেলা! আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বযুদ্ধ না প্রীতি-ক্রিকেট! লোকটার বুদ্ধিবিবেচনা বলে কিছুই নেই বোধহয়। দ্বিতীয় বলটার জন্য তৈরি হয়ে দাঁড়ালাম। অনেকটা দূর থেকে ছুটে আসছে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান দৈত্য। সমস্ত স্নায়ু টানটান হয়ে উঠল। এবার বল আর মাটিতে পড়ল না। সোজা ছুটে এল বুকের দিকে। বিমার! সর্বনাশ! গায়ে লাগলে আর দেখতে হবে না। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশে সরে গেলাম। শরীরের পাশ দিয়ে যেন কামানের গোলা ছুটে বেরিয়ে গেল। এবার উইকেটকিপারকে বোকা বানিয়ে বাউণ্ডারিতে ছুটে গেল বল। চারটে বাই রান আমরা পেলাম বটে, কিন্তু চমকে উঠলাম আমি। এ কী, গিলি তো দুরভিসন্ধি নিয়ে বল করছে। উইকেট পাওয়া তার লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য হচ্ছে ব্যাটসম্যানকে আঘাত করা।

অধিনায়ক উম্রিগড়ের উচিত ছিল বোলারকে এমন বল করতে নিষেধ করা। কিন্তু নিষেধ করা দূরে থাক, তাকিয়ে দেখি, উম্রিগড় অন্য দিকে দেখছেন। ব্যাপারটা বুঝে নিতে আমার একটুও দেরি হল না। মানে তো জলের মতো পরিষ্কার। উম্রিগড়ও এই বর্বরতাকে স্পষ্টভাবে সমর্থন করছেন। সুতরাং এই কাণ্ড চলবে। তৃতীয় বল—আবার বিমার। এবার মাথার একটু উপর দিয়ে। এই ভাবে বাউন্সার-বিমারের বন্যা ছুটিয়ে ওভার শেষ করল গিলক্রিস্ট। বুঝলাম, এর মধ্য দিয়েই আমাকে খেলে যেতে হবে।

সে-ইনিংসে ভাল রানই করেছিলাম। সেঞ্চুরি করতে পারিনি এই আক্ষেপকে ঢেকে দিয়েছিল একটি নির্ভুল ইনিংস। আমাকে ঠিকমতো কব্জা করতে না-পারার ফলে গিলক্রিস্ট রাগে গরগর করতে লাগল। (ক্রমশ)

'ব্যাটে-বলে' লেখাটিতে (২৫ জানুয়ারি, ১৯৮৪) শ্রীপঙ্কজ রায় জানিয়েছিলেন, ভিনু মাঁকড় মেলবোর্ন টেস্টে বার্নেসকে একবার নিষ্কৃতি দেন ও পরে তাঁকে রান-আউট করেন। কলকাতা থেকে শ্রীমন্মথ গুপ্ত জানাচ্ছেন যে, মাঁকড় আসলে মেলবোর্ন-টেস্টে এইভাবে আউট করেছিলেন ব্রাউনকে, বার্নেসকে নয়। এর আগে কুইন্সল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে খেলা চলবার সময়েই মাঁকড় ব্রাউনকে সতর্ক করে দেন।

'গোরুমারা' ফরেস্ট

অমরনাথ দে

অনেক টালবাহানার পর শিকারের দিন ঠিক হয়ে গেল। পট্‌কাদা তৈরি, ভজহরিদা, অজয়দা এঁরাও। এ-যাত্রায় পট্‌কাদাই দলনেতা। সঙ্গে যাবে সমর আর বাচ্চু।

শীতকাল। বনে-জঙ্গলে হাঁটতে হবে মাইলের পর মাইল, তবেই বনশুয়োরের আস্তানা। বেলা থাকতেই তিন শিকারি, সমর আর বাচ্চু রওনা হয়ে গেল বনমহলের দিকে। পট্‌কাদার কাঁধে দোনলা বন্দুক, ভজহরিদার একনলা, অজয়দার পয়েন্ট টু টু বোর। বাচ্চু আর সমরের ঝোলা-ব্যাগে যাবতীয় সাজসরঞ্জাম। শতরঞ্চ থেকে শুরু করে দড়ি, ছুরি, টর্চ, টিফিন ক্যারিয়ার, ওয়াটার বট্‌ল, মায় দড়ির ঝুলন্ত দোলনা।

আসল শিকারি পট্‌কাদা। বাকি সকলেই শিক্ষানবিশ। ভজহরিদা একদিন পুকুরের পাড়ে ঘুঘু শিকার করতে গিয়ে হঠাৎ উলটে পড়েছিলেন বর্ষার এঁটেল মাটিতে। তারপর জামাকাপড়, মাথার চুল, এমনকী কার্তুজের থলি, বন্দুক ভিজে একাকার। ঘুঘু ততক্ষণে উড়ে গেছে। ভজহরিদার বিশাল বপুর চাপে মারা গেছে প্রায় শ'খানেক ব্যাঙাচি।

শিক্ষানবিশ হলেও অজয়দার লক্ষ্য অব্যর্থ। ট্রিগার টানার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে হবে শিকার ভূপাতিত হয়েছে। তবে একটা ভয়ানক ব্যাধি কাবু করেছে তাঁকে। ট্রিগার টানার সঙ্গে-সঙ্গে বাঁকা আঙুল আটকে যায়। সোজা করা বেশ দুঃসাধ্য ব্যাপার। চিৎকার-চেঁচামেচির মধ্যে অন্য কারুর সাহায্যে মালিশ-টালিশ করে আঙুল খুলতে হয়। ডাক্তার বলেছেন এক ধরনের বাত, ট্রিগার ফিঙ্গার। একবার যাযাবর-হাঁস মারতে গিয়ে এই বিপত্তি। দামোদরের চরে রোদ পোয়াচ্ছে হাঁসের দল। অজয়দা শুঁড়ি মেরে এগুচ্ছেন। শুটিং রেঞ্জের মধ্যে আসতেই গর্জে উঠল বন্দুক। বালির ওপর উলটে পড়ল বড়সড় একটা হাঁস। এদিকে অজয়দার আর্তনাদ, "বাচ্চু রে, মরে গেলাম, আঙুল ছাড়া!"

অন্ধকার নামতেই বনমহলের নদীর ধারে পৌঁছে গেল শিকারির দল। তিনদিকে তিনটে বড় গাছ বেছে নিলেন পট্‌কাদা। একটাতে বসবেন পট্‌কাদা নিজে, দ্বিতীয়টিতে ভজহরিদা ও সমর। তৃতীয়টিতে অজয়দা আর বাচ্চু। নদীর ধারে মাটিতে বনশুয়োরের বেশ কিছু টাট্‌কা পায়ের দাগ পাওয়া গেল। ঠিক হল বনশুয়োর বা বাঘটাঘও যদি জল খেতে এসে যায়, যে যার সুযোগমতো গুলি চালাবে, আর নেহাত প্রয়োজন না হলে কেউ শব্দ করবে না।

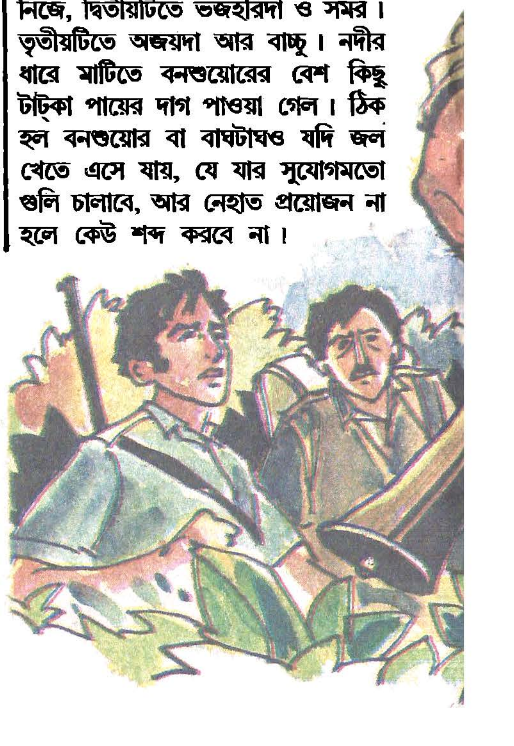

পঞ্চমীর চাঁদ ধীরে ধীরে উঠে এল মাঝ-আকাশে। ঝাপসা রুপোলি আলোতে ভাসতে লাগল বনমহলের গাছগাছালি। দূরের বড় গাছগুলো, মনে হল, যেন এক বিরাট সেনাবাহিনী, মার্চ করে এগিয়ে আসছে। সামনের ছোট গাছগুলো গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসা মানুষের মতো।

কিছু টিফিন করে গাছে উঠে পড়ল সকলেই। রাত্রে কোনো খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা নেই, কারণ তাতে ঘুম এসে যেতে পারে।

নিঝুম রাত। সকলেই চুপচাপ সতর্ক চোখে তাকিয়ে আছে চারিদিকে। দূর থেকে কয়েকটা নিশাচর পাখির ডাক কানে আসছে। নিজেদের হাতঘড়ির রেডিয়াম জ্বলজ্বল করছে। আশেপাশে কিছু জোনাকিও।

প্রায় ঘন্টাখানেক এইভাবে নিঃশব্দে কাটল। অজয়দা ফিসফিস করে উঠলেন, "নাঃ আর পারছি না, একটা সিগারেট না খেলেই নয়।"

বাচ্চু বলল, "একদম না। সব গোলমাল হয়ে যাবে, যদিও দু-একটা জন্তু-জানোয়ার আসত, আগুন-টাগুন জ্বাললে সে গুড়েও বালি।"

হঠাৎ একটা খসখস শব্দ হতেই সকলে তাকাল জঙ্গলের দিকে। জ্বলন্ত চোখের মতো মনে হচ্ছে না? চোখ রগড়ে সবাই

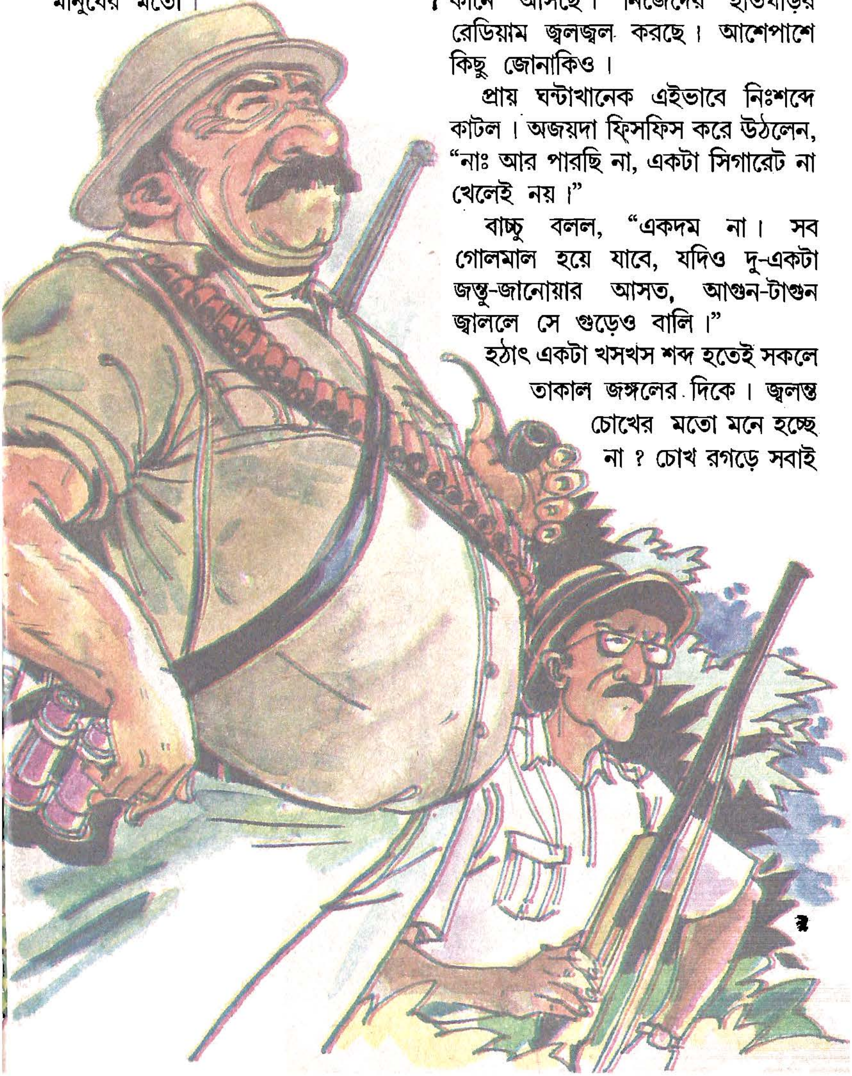

দেখল, সত্যি সত্যিই দুটো জ্বলন্ত চোখ এগিয়ে আসছে। প্রকাণ্ড জানোয়ারটা গাছপাতা মাড়িয়ে দুদ্দাড় করে এগিয়ে আসছে।

অজয়দা দেখেছেন ব্যাপারটা। এবার ফিসফিস করে বললেন, "এ তো শুয়োর নয়, আরও বড় জানোয়ার। মনে হচ্ছে বড় হরিণ-টরিন। বাচ্চু, তুই তৈরি থাক, আমি এইম করছি।"

ভজহরিদার অনেকক্ষণ থেকেই লক্ষ ছিল চোখদুটোর দিকে। উত্তেজনায় তাঁর কথা আটকে যায়। নাকে কিসের যেন গন্ধ পেয়ে ফিসফিস করে বললেন, "সর্বনাশ, বা-বাঘ।"

সমর নড়েচড়ে বসল, "শিগগির গুলি করুন।"

ভজহরিদার হাত কাঁপছে। বললেন, "আর পারছি না, হয়ে গেল।"

সমর বলল, "তার মানে?"

ভজহরিদার মুখে কথা নেই।

সমর বলল, "বুঝেছি। এক্ষুনি গুলি চালান, নইলে যে খেয়ে ফেলবে।"

ভজহরিদা আবার তোতলালেন, "র-র-র-রয়েল...।" তারপরেই চুপচাপ।

মুহূর্তের মধ্যেই জঙ্গলের নিস্তব্ধতা খান্‌খান্ করে দু'-দু'বার বন্দুক গর্জে উঠল, গুড়ুম গুড়ুম। আর সঙ্গে সঙ্গে নদীর ওপারে গাঁক করে একটা শব্দ হল। ওদিকে অজয়দার আর্তনাদ, "বাচ্চু রে আঙুল ছাড়া।" পট্‌কাদার গাছের নীচে 'ধপাস' করে একটা শব্দ। আবার চারদিক নিস্তব্ধ। কোথা থেকে কী যেন ঘটে গেল মুহূর্তে।

প্রায় মিনিট পাঁচেক কেটে গেল, কারুর মুখে কোনো কথা নেই। মালিশ-টালিশ করে আঙুল ঠিক হতেই অজয়দা প্রথম মুখ খুললেন, "হ্যাঁ রে বাচ্চু, সবসুদ্ধ দুটো গুলির শব্দ হল। আমার গুলির পর আর কে গুলি চালাল বল তো? পট্‌কাদা, না ভজহরি?"

বাচ্চু বলল, "বোধহয় ভজহরিদা।"

অজয়দা বললেন, "উঁহু, পট্‌কাদা। কিন্তু আশ্চর্য। আমার তো আঙুল আটকে গেল, কিন্তু পট্‌কাদা আর একবার ফায়ার করলেন না কেন? জানোয়ারটা তো গুলি খেয়ে পালিয়ে গেল।"

বাচ্চু বলল, "পালিয়ে গেল?"

অজয়দা বললেন, "গুলি লেগেছে। তবে জখম হয়ে জানোয়ারটা জঙ্গলের দিকে ছুটে গেল, আমি ভাল করে লক্ষ করেছি। কিন্তু পট্‌কাদা, ভজহরি, সমর, এদের সাড়াশব্দ নেই কেন? বাচ্চু, একটা কিছু আওয়াজ কর তো।"

বাচ্চু চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিচু গলায় ডাকল, "সমর, সমর!"

দ্বিতীয় গাছ থেকে সমরের গলা শোনা গেল, "বাচ্চু, বোতলে জল আছে?"

"আছে। টর্চ জ্বাল্, এবার নামা যাক।"

"নামব কী, ভজহরিদাকে ধরতে হবে। সেন্সলেস।"

"সেন্সলেস? মাই গড্, পট্‌কাদাকে ডাক্।"

অজয়দা আর বাচ্চু গাছ থেকে নামল। ধরাধরি করে ভজহরিদাকে নামানো হল। ঘাসের ওপর শতরঞ্জ পেতে শোয়ানো হল। ভজহরিদা তখনও গোঁ-গোঁ করছেন।

অজয়দা বললেন, "ভজহরির ফিটের ব্যামো আছে বলে তো জানতুম না। হ্যাঁ রে বাচ্চু, সেদিন ঘুঘু মারতে গিয়ে পড়ে যাওয়াটা তাহলে অন্য কিছু নয়, ফিটের ব্যামো?"

ঘাড় নাড়ল বাচ্চু। দেখতে দেখতে

কাকভোর হয়ে গেল। চারদিকে হরেক পাখির ডাক আর বুনোফুলের গন্ধ, বনমহলের বাতাস এলোমেলো ছুটছে। পট্‌কাদার গাছের কাছে গিয়ে দেখা গেল পট্‌কাদা নেই। বন্দুকটা মাটিতে পড়ে আছে। পট্‌কাদা গেলেন কোথায় ? ব্যাপারটা কী ?

ভজহরিদার জ্ঞান ফিরেছে। তিনি বললেন, "টা-টা-টা।"

সমর ধমক দিল, "ভজহরিদা, চুপ করুন। তখন রয়েল বলতে গিয়ে অজ্ঞান হলেন, এবার টাইগার বলতে গিয়ে একটা বিভ্রাট বাধাবেন মনে হচ্ছে।"

ঠিক এই সময় প্রায় পঞ্চাশ মিটার দূরে একটা চাঁইপাথরের পিছন থেকে পট্‌কাদার গলা শোনা গেল, "আমি এখানে।"

অজয়দা, বাচ্চু, সমর ছুটে গিয়ে দেখল, পট্‌কাদা কোমর-ব্যথায় কাতরাচ্ছেন। অজয়দা বললেন, "ঘটনাটা কী পট্‌কাদা ?"

পট্‌কাদা বাচ্চুর কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "একটা বিরাট বাঘ। গুলি খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয় গুলিটা করার জন্যে আমি বিদ্যুৎগতিতে লাফ মেরে ফলো করেছি, কিন্তু হঠাৎ পায়ে একটা বুনোলতা জড়িয়ে গিয়ে পড়ে গেলাম। বনশুয়োরের আস্তানায় বাঘ এসে পড়বে, এ কি ভাবা যায় ?"

অজয়দা সমরের কানে-কানে বললেন, "মনে হচ্ছে পট্‌কাদা গাছ থেকে পড়ে গেছেন, আর হাত ফসকে গুলি বেরিয়ে গেছে। দেখছিস না পট্‌কদার প্যান্টের কিছুটা ছিড়ে গিয়েছে। এখানে-ওখানে রক্তের ছিটে।"

নদীর পারে অনেক খোঁজাখুঁজির পর জানোয়ারের সামান্য রক্তের দাগ ছাড়া বাঘ বা হরিণের কোনো হদিস না পেয়ে বাড়ি ফিরে গেল সকলে।

পরের দিন বেলা দশটা নাগাদ পট্‌কাদার শ্বশুরমশাই এসে হাজির। পট্‌কাদাকে ঘুম থেকে তুলে বললেন, "বাবাজীবন, আমার সঙ্গে একবার থানায় যেতে হবে। দারোগাবাবুকে বলেকয়ে একটা তদন্তের ব্যবস্থা করা দরকার। এ অত্যাচার আর সহ্য হয় না।"

পট্‌কাদা শশব্যস্ত হয়ে বললেন, "নিশ্চয় যাব। থানার বড়বাবু আমার বিশেষ পরিচিত। বন্ধু বললেই চলে। কিন্তু ব্যাপারটা কী বলুন তো ?"

শ্বশুরমশাই প্রায় কেঁদে ফেলেন, বললেন, "আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। পনরোশো টাকা দামের আমার অমন সুন্দর দুধেল হরিয়ানা গোরুটাকে গতরাত্রে চোরা-শিকারিরা গুলি করে মেরে ফেলেছে। দুপুরে বনমহলে চরতে গিয়ে হারিয়ে যায়। তারপর আজ সকালে জঙ্গলের মধ্যে খুঁজতে গিয়ে দেখি, সব শেষ।"

পট্‌কাদা এবার যেন আকাশ থেকে পড়লেন। আশ্চর্য ! তবে কি ... বারান্দায় চা খাচ্ছিলেন অজয়দা। তাড়াতাড়ি তাঁকে একপাশে ডেকে এনে বললেন, "এখন উপায় ?"

কাছেই ছিল সমর। চটপট বলল, "উপায় আর কী। আপনাদের এলেম তো বুঝলাম। আজ থেকে বনমহলের নাম দিয়ে দিন 'গোরুমারা' ফরেস্ট আর চাঁদা করে শ্বশুরমশাইয়ের টাকাটা যত তাড়াতাড়ি পারেন মিটিয়ে দিন। ব্যাস্, তাহলেই ল্যাঠা চুকে যায়।"

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

বকখালিতে বিপদ

সুব্রত নিয়োগী

এস্‌প্লানেডে সি· এস· টি· সি-র বুকিং অফিস থেকে আমাদের পাঁচজনের বাসের টিকিট এক সপ্তাহ আগেই কেনা ছিল। রিজার্ভেশনসুদ্ধ। মানে, বুড়োদা, সামপানদা, মুন্নি, চন্দোরকাকু আর আমার।

বুড়োদাদা একটা টেলিফোন করেছিল শুধু। বলেছিল, "বুঝলি কাবুল, সামনের রবিবার দু'তিন দিনের জন্য বকখালি যাব। তুই যাবি নাকি?"

বুড়োদাদা হঠাৎ বকখালিতে! শুনেই কেমন যেন রহস্যের গন্ধ পেলাম। এত

জায়গা থাকতে বকখালিতে বুড়োদাদা!

"কী ব্যাপার বুড়োদাদা, কোনো খবর আছে নাকি?"

"না রে সে-সব কিছু নয়। আয় না, বলব সব।"

"কে কে যাবে বলো তো?"

"কে আবার—আমি, তুই আর সামপান। আর হয়তো চন্দোরকাকু।

চন্দোরকাকুর নাম শুনে মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। চন্দোরকাকু মানেই খালি এটা কোরো না, আর ওটা কোরো না। এটা খেয়ো না, সেটা খেয়ো না। ওদিকে যেয়ো না, সেদিকে যেয়ো না। ভাল্লাগে নাকি এসব বাইরে গিয়ে?

যাই হোক, আমি তো আনন্দে নেচে উঠলাম। বুড়োদাদার সঙ্গে যেতে পারবে বলে মুন্নিও বায়না ধরল। বকখালির নামে প্রথমে একটু আপত্তি করেছিল মুন্নি। ঘেন্নায় মুখ কুঁচকে বলেছিল, "ওটা আবার সমুদ্র নাকি। সমুদ্র যদি দেখতে হয়, তবে পুরী কিংবা ওয়ালটেয়ার।" তবে সমুদ্রের চেয়ে বুড়োদাদার আকর্ষণ ওকে টেনেছিল

বেশি। বুড়োদাদা মানেই হরেক মজা, হরেক উত্তেজনা।

ভোরবেলা বাসে উঠে চন্দোরকাকুকে দেখে ভাল লাগল না। ভেবেছিলাম, যাবার দিন যদি সকাল থেকে দারুণ শরীর খারাপ হয় চন্দোরকাকুর তো বেশ ভাল হয়। অথচ কিছুই হয়নি তার, বরং ভারী ঝরঝরে দেখাচ্ছে। ভুঁড়ির ওপর চওড়া একটা চামড়ার বেল্ট পরেছে চন্দোরকাকু। গায়ে জহরকোটের মতো ছোট্ট এক বুকখোলা কোট। সঙ্গে দু-ব্যাগ ভর্তি খাবার-দাবার। সবই বাড়িতে তৈরি। চন্দোরকাকু রাস্তায় বেরিয়ে বাইরের খাবার খেতে দেয় না। চন্দোরকাকুকে দেখে মুন্নি গাল ফুলিয়ে বসে রইল। আমারও ভারী খারাপ লাগছিল।

আমাকে আর মুন্নিকে দেখে চন্দোরকাকু হেঁ হেঁ করে উঠল। তারপর মুন্নির দিকে তাকিয়ে বলল, "তোর পরীক্ষা কবে রে মুন্নি?"

বেড়াতে বেরিয়ে পরীক্ষার কথা শুনলে বুকের ভেতরটা কার না গুড়গুড় করে ওঠে। মুন্নি চন্দোরকাকুর দিকে না তাকিয়ে বলল, "নভেম্বরের লাস্ট উইকে।"

চন্দোরকাকু বলল, "তোর আসা উচিত হয়নি মুন্নি, পরীক্ষা নিয়ে ছেলেমানুষি করিস না।"

অথচ মুন্নি কী করে বোঝাবে চন্দোরকাকুকে যে, পরীক্ষার পড়া তার ঠোঁটস্থ।

বাসে একটা লোক সিলোফেনের ব্যাগে করে ডালমুট বিক্রি করছিল। মুন্নি তার কাছ থেকে এক প্যাকেট ডালমুট কিনতেই চন্দোরকাকু হাহা করে তেড়ে এল। "ডালমুট খাস না মুন্নি, ওতে জীবাণু একেবারে কিলবিল করছে। তোর আর কাবুলের জন্য আমি পাঁউরুটি আর জ্যাম এনেছি।" বলেই চন্দোরকাকু মুন্নির হাত থেকে ডালমুটের প্যাকেটটা প্রায় ছোঁ মেরে কেড়ে নিল। ডালমুটঅলার করুণ মুখটা দেখে আমার ভারী খারাপ লাগছিল।

বাস ঠিক সকাল সাতটায় ছাড়ল। বাসভর্তি লোক। আমরা জোড়া সিটে দু'জন দু'জন করে বসে আছি। সব চেয়ে পেছনে আমি আর চন্দোরকাকু, তার আগে মুন্নি আর সামপানদা, ড্রাইভারের পেছনে একমাত্র সিটে স্বনামধন্য বুড়োদাদা।

আমি নতুন কেনা টিনটিনের একটা বই পড়ছিলাম। যমজ গোয়েন্দা কীভাবে আসল অপরাধী ছেড়ে টিনটিনকে বন্দী করছে। কীভাবে টিনটিন তাদের হাত ছাড়িয়ে ছুটছে আসল অপরাধীর পেছনে। টিনটিনের ছোট্ট কুকুর কী আশ্চর্য উপায়ে টিনটিনকে বাঁচিয়ে দিচ্ছে নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে—এ সব রুদ্ধশ্বাসে গিলছিলাম। মুন্নি টিনটিনের বইটা পাবার জন্য আব্দার করছে।

সামপানদা বলল, "এই কাবুল, বইটা ওকে একবার দে না।"

আমি বললাম, "আমার তো এখনও শেষ হয়নি বইটা।"

মুন্নি বলল, "আমি একটুখানি দেখেই বইটা দিয়ে দেব।"

আমি বললাম, "না, বইটা হাতে পেলে মুন্নি কিছুতেই ছাড়বে না।"

চন্দোরকাকু দু' টিপ নস্যি নিয়ে বলল, "তোরা এত কমিকস পড়িস কেন বল্ তো? ওতে ইমাজিনেশন নষ্ট হয়। ভাল গল্পের বই পড়তে পারিস্ না।"

আমি তাড়াতাড়ি বইটা লুকিয়ে ফেলি ব্যাগে।

বুড়োদা কারুর সঙ্গে কথা বলছে না।

দারুণ গম্ভীর দেখাচ্ছে বুড়োদাকে। বুড়োদার সঙ্গে কথা বলতে গেলেই বুড়োদা ইশারা করে চুপ করতে বলছে। বুড়োদা একমনে একটা মোটা বই পড়ে যাচ্ছে। আমি আর কথা না বলে বুড়োদা কী বই পড়ছে লক্ষ করতে চেষ্টা করি। বইটার উপর অনেকগুলি পাখির ছবি। বুড়োদা এমনভাবে বইটা ধরে আছে যে, আমি কিছুতেই বইয়ের নামটা পড়তে পারছি না। বুড়োদা জল খাবার জন্য ওয়াটার বটল বের করতে গেলে কোলের উপর বইটা উল্টে রাখে। সেই ফাঁকে বইয়ের নামটা দেখে নিই আমি—বার্ডস অব ইণ্ডিয়া। লেখকের নাম সলিম আলি।

বুড়োদা হঠাৎ পাখি নিয়ে! বুড়োদাকে কিছু বলার সাহস হল না। সামপানদাকে পেছন থেকে ফিসফিস করে বললাম, "কী ব্যাপার, বুড়োদা আবার কী মতলব আঁটছে।"

সামপানদা বলল, "প্রতি বছর শীতকালে নাকি বকখালিতে নানা জাতের পাখি আসে। বিশেষ করে সি-গাল ও বক আসে প্রচুর। কোন্ এক রেয়ার বকের খোঁজে বুড়ো বকখালি যাচ্ছে।"

"ওহ্, তাই বলো, আমি তো ভেবেই মরছিলাম।"

বুড়োদা বই পড়তে পড়তে হঠাৎ মাথা তুলে বলল, "বুঝলি সামপান, আমাদের রাগ-রাগিণীর উৎপত্তি হয়েছে পাখির গান থেকে।"

মুন্নি বলল, "সে কী, তাই নাকি, কই, এর আগে তো শুনিনি।"

বুড়োদা মুন্নির কথার কোনো জবাব দেয় না। সামপানদাকে উদ্দেশ করে বলে যায়, "এক ধরনের পাখি আছে, শীতকালে একেবারে আর্কটিক থেকে উড়ে চলে আসে ট্রপিকসে।"

চন্দোরকাকু এ সব কথা শুনছিল না। আপনমনে পাউরুটিতে জ্যাম মাখাচ্ছিল।

সামপানদা বলল, "রিয়েলি! ভাবা যায় না।"

মুন্নি বলল, "দারুণ তো!"

আমি কোনো কথা বলছি না বলে আমাকে উদ্দেশ করে বুড়োদা বলল, "জানিস কাবুল, স্কারলেট আইবিস বলে এক ধরনের বক আছে। ঘোর লাল রঙ। আগে মিশরীয়রা বকের পুজো করত। দেখবি, মিশরের পিরামিডের গায়ে, কিংবা ওদের পুরনো পুঁথি-টুতিতে বকের ছবি আছে। অথচ আজকাল মধ্যপ্রাচ্যের বহু দেশের লোকেরা এই বককে অমঙ্গলের চিহ্ন বলে ভাবে। বাড়ির কাছাকাছি এই বককে দেখলে পাথর ছুঁড়ে না মেরে ফেললে কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীদের শান্তি নেই।"

একেবারে বেহালার তারাতলায় এসে বাস থামল। এখান থেকে বেশ কিছু লোক উঠল বাসে। আমাদের সিটের পাশে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে কিছু লোক। আমি বাসে দাঁড়িয়ে থাকা একজন লোকের সঙ্গে কথা বলছিলাম। লোকটি আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, আমরা কোথায় যাচ্ছি, বকখালিতে থাকার জায়গা কোথায়।

চন্দোরকাকু কানের কাছে মুখ এনে বলল, "অপরিচিত লোকের সঙ্গে কথা বলিস না কাবুল। অনেক মানুষের হিপ্নোটাইজ করার ক্ষমতা থাকে। হয়তো ওর সঙ্গেই নেমে-পড়বি তুই আমাদের ছেড়ে।"

"কী যে বলো চন্দোরকাকু।"

"হ্যাঁ রে, দিনকাল বড় খারাপ। কোথা থেকে যে কী ঘটে যাবে, কেউ বলতে পারে না।"

চন্দোরকাকুর কথায় আমি চুপ করে যাই।

আমার আর চন্দোরকাকুর **কথা** বুড়োদা শুনতে পায়নি। সামপানদাকে বলল, "বুঝলি সামপান, বকখালিতে এত রেয়ার বক আসে শীতকালে, তুই ভাবতে পারবি না।"

সামপানদা বলল, "তুই যদি ওখানে স্কারলেট আইবিস পেয়ে যাস হঠাৎ, কী করবি ?"

"প্রথমে একটা ছবি তুলব কালার ফিল্মে। তারপর নানা অ্যাঙ্গেল থেকে আরো।"

একটু থেমে বুড়োদা আবার বলল, "স্কারলেট আইবিসের গায়ের রঙটা যদি হুবহু আনতে পারি ফোটোতে, তো শুধু ওর ছবি নানা ম্যাগাজিনে ছাপিয়েই আমার বকখালি আসার খরচ তুলে নেব। ওর পালকগুলো দারুণ সুন্দর। পালকের লোভে মানুষ যে এই ধরনের কত বক মেরে ফেলেছে, কী বলব !"

চন্দোরকাকু বলল, "বকটাকে যদি ধরে এনে চিড়িয়াখানায় দেয়া যায়, বড় ভাল হয়।"

বুড়োদা সে-কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বলল, "আমেরিকান গভর্নমেন্ট যদি এদের প্রোটেকশনের ব্যবস্থা না করত, তবে কবেই এ-জাতীয় বক ডোডোপাখির মতো লুপ্ত হয়ে যেত।"

বুড়োদার মুখে বকের গল্প শুনতে শুনতে কখন যে ডায়মণ্ডহারবার চলে এসেছি, খেয়াল নেই।

মুন্নি হঠাৎ চিৎকার করে বলল, "দ্যাখো, কী সুন্দর সমুদ্র। কত বড় বড় জাহাজ দ্যাখো।"

বুড়োদা বলল, "দূর বোকা, ওটা সমুদ্র নয়, গঙ্গা। সমুদ্রের কাছে এসে এত চওড়া হয়ে গেছে।"

সামপানদা বলল, "এ-জায়গাটার আগে নাম ছিল হাজিপুর। ডায়মণ্ডহারবার ইংরেজদের দেওয়া নাম।"

ওখানে নেমে আমাদের মিষ্টি-টিষ্টি খাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল। তবে চন্দোরকাকুর ভয়ে একমাত্র ডাব ছাড়া কিছুই খাওয়া হল না। কচি ডাবের ঠাণ্ডা জল খেয়ে ক্লান্তি দূর হল।

বাস স্টার্ট দিতেই বুড়োদা বলল, "আর এক ঘন্টার মধ্যে আমরা কাকদ্বীপ পৌঁছব, সেখান থেকে আর আধঘন্টার মধ্যে নামখানা।"

দু'পাশের মাঠ চিরে আমাদের বাস এগিয়ে চলল। মাঝে মাঝে পুকুর। পুকুরে হাঁস। গাছপালা, খেতি।

দেখতে দেখতে আমরা নামখানায় পৌঁছে গেলাম।

বুড়োদা বলল, "তাড়াতাড়ি করে নেমে নদীর ধারে চলে যাবি ছুটে, না হলে প্রথম নৌকোয় উঠতে পারবি না। প্রথম নৌকোয় না উঠতে পারলে ওপারের বাসে জায়গা পাওয়া যাবে না।"

বাসের লোকেরা হুড়মুড় করে নেমে ঘাটের দিকে দৌড়তে লাগল। সঙ্গে আমরাও। চন্দোরকাকু মোটা বলে, আর সঙ্গে মালপত্র ছিল বলে, আমাদের অনেক পিছনে হাঁটছিল।

আমরা এক ছুটে গিয়ে নৌকোয় উঠে পড়লাম। নৌকোয় ঠাসাঠাসি ভিড়। নৌকাটা ছাড়ব ছাড়ব করছে। চন্দোরকাকু খুব তাড়াতাড়ি ঘাটের ঢাল বেয়ে নেমে আসছে। ঘাটে কাদা ছিল বলে হঠাৎ পা পিছলে চিতপটাং হয়ে পড়ে গেল চন্দোরকাকু। আমরা হো হো করে হেসে উঠলাম। চন্দোরকাকুর হাত থেকে দুটো ব্যাগের মালপত্র মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে।

আমাদের নৌকো নদীর মাঝখানে। ছলাতছল বৈঠার আওয়াজ। বাতাস মাছের আঁশটে গন্ধে ভরপুর।

বুড়োদা বলল, "চন্দোরকাকুর জন্য

ওপারে বাসে একটা জায়গা রাখিস সামপান। পরের নৌকোয় চন্দোরকাকু চলে আসবে।"

চন্দোরকাকু পারে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে, "মাঝি, নৌকো থামাও।"

কিন্তু লোক বেশি হয়ে গিয়েছিল বলে নৌকো থামল না। এগিয়ে চলল।

বুড়োদা বলল, "এ নদীটার নাম হাতানিয়া-দোয়ানিয়া।"

মুন্নি বলল, "বাঃ, কী সুন্দর নাম, হাতানিয়া-দোয়ানিয়া।"

বুড়োদা বলল, "এটা সত্যিকারের নদী নয় কিন্তু। ইংরেজ আমলে খালটা কাটানো হয়েছিল, জানিস তো?"

নৌকো থেকেই ওপারে চন্দোরকাকুকে দেখা যাচ্ছে। চন্দোরকাকু দু'হাত তুলে চেঁচাচ্ছে।

বুড়োদার দিকে তাকিয়ে দেখি, বুড়োদার মুখটা কেমন গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। অথচ এই তো কয়েক মুহূর্ত আগে কেমন মজার মজার কথা বলছিল বুড়োদা।

আমি খুব কাছ থেকে বুড়োদাকে লক্ষ করে যাচ্ছি। এখন কোনো কথা বললে বুড়োদা উত্তর দেবে না, নয়তো খুব রেগে যাবে। তাই কথা না বলে চুপ করে থাকি।

হঠাৎ বুড়োদা হেঁচে উঠল। বুড়োদা হাঁচতেই আমরা তিনজন মানে আমি, মুন্নি আর সামপানদা সজাগ হয়ে উঠলাম। আমরা তিনজনেই সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ রাখছি বুড়োদা কবার হাঁচে। বুড়োদা তিনবার হাঁচা মানেই অবধারিতভাবে বুড়োদার ইনটুইশান কাজ করবে এবার। দারুণভাবে বলে দেবে অজানা রহস্যময় কিছু একটা। আমরা নৌকোর অন্যান্য যাত্রীর দিকে চোখ রাখি। একজন দাড়িঅলা, কালো-গগ্‌লস-পরা ফর্সা স্বাস্থ্যবান লোককে দেখে আমাদের চোখ আটকে যায়। লোকটার গায়ে লাল রঙের জামা আর সাদা ট্রাউজার।

আমাদের তাকাতে দেখে লোকটা কেমন অস্বস্তিতে পড়ে যায় যেন। আর সঙ্গে-সঙ্গে বুড়োদা আরো দু-বার হাঁচে। মানে বুড়োদা মোট তিনবার হাঁচল।

বুড়োদা তিনবার হাঁচার সঙ্গে সঙ্গে মুন্নি আমার গায়ে একটা চিমটি কাটল। মানে এক্ষুনি এই নৌকোয় কিছু একটা ঘটে যাবে।

রুমাল দিয়ে নাকটা মুছে নিয়ে বুড়োদা সামপানদাকে ফিসফিস করে বলল, "লাল-জামা-পরা, কালো ব্রিফকেস হাতে, দাড়িঅলা আর গগলস-পরা ফর্সা লোকটা কোনো ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটির সঙ্গে জড়িত।"

বুড়োদার কথা শুনে ফেলেছিলাম আমি। তাই দারুণ মজা লাগছিল। বকখালিতে এসেও রহস্যের খোঁজ পেয়ে যাব, ভাবিনি।

প্রায় গায়ে পড়েই লোকটার সঙ্গে আলাপ করলাম।

"আপনি বুঝি বকখালিতে যাচ্ছেন?"

"না, ফ্রেজারগঞ্জ।"

"ফ্রেজারগঞ্জ বকখালি থেকে কতদূর?"

"কাছেই, সমুদ্রের পার দিয়ে গেলে মাইল খানেকের মধ্যেই।"

"বেড়াতে যাচ্ছেন বুঝি?"

লোকটা হোহো করে হেসে উঠে বলল, "না, আমাদের বিজনেস আছে ওখানে।"

"কিসের বিজনেস?"

"ফ্রেজারগঞ্জের ভেড়ি থেকে চিংড়ির বাচ্চা নিয়ে এসে সুইট ওয়াটারে ছেড়ে

দিই। সেই মাছ বড় হলে বিদেশে চালান দিই।"

মুন্নি বলল, "সুইট ওয়াটার কাকে বলে?"

লোকটা আবার হোহো করে হেসে উঠে বলে, "শরবত নয় কিন্তু। যে জল নোনতা নয়, যে জলে মাছ বাড়তে পারে ভাল, তাকে সুইট ওয়াটার বলে।"

মুন্নি বলল, "দারুণ ব্যবসা তো!"

লোকটা বলল, "হ্যাঁ, চিংড়ি খাবে নাকি খুকি, তবে চলো আমার সঙ্গে।"

খুকি বলায় মুন্নি খুব রেগে গেছে। সামনের বছর ক্লাস নাইনে উঠবে সে।

বুড়্ঢাদা কোনো কথা বলছিল না। লোকটা বুড়্ঢাদাকে লক্ষ করে বলল, "এ-জলে কামঠ আছে জানেন?"

"কামঠ কী বুড়্ঢাদা?" মুন্নি জিজ্ঞেস করল।

কেউ কোনো কথা বলছে না দেখে লালজামা-পরা লোকটা বলল, "কামঠ জান না? ছোট-ছোট কচ্ছপকে কামঠ বলে।" বলে যেন দারুণ একটা রসিকতা করেছে, এই ভঙ্গিতে খিক্‌খিক্ করে হাসতে লাগল।

ইতিমধ্যে নৌকো এসে ওপারে থামল। নৌকোর লোকজন তাড়াতাড়ি ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা বাসের দিকে দৌড়ে গেল। আমাদের সঙ্গে সেই ফর্সা দাড়িঅলা লোকটাও বাসের দিকে ছুটে যায়।

কেবল বুড়্ঢাদা চন্দোরকাকুর জন্য দাঁড়িয়ে রইল। পরের নৌকো এলে চন্দোরকাকুকে নিয়ে আসবে।

আমরা এসেই বাসে জায়গা পেয়ে গেছি। বুড়্ঢাদা আর চন্দোরকাকুর জন্য আমরা দুটো জায়গা রেখে দিলাম।

নৌকোর সেই ফর্সা দাড়িঅলা লোকটা আমাদের কাছাকাছি বসে আমাদের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছে।

একটু পরেই বুড়্ঢাদা চন্দোরকাকুকে নিয়ে বাসে উঠল। চন্দোরকাকুর সারা গায়ে কাদা লেগে আছে। দু' কাঁধে দুটো সাইড-ব্যাগ। আমাদের দেখতে পেয়ে চন্দোরকাকু দারুণ রেগে গেল। কাউকে বকতে না পেরে আমাকে বলল, "কাবুল, তুমি জানো না বড়দের আগে জায়গা ছেড়ে দিতে হয়? আমাকে ফেলে তোমরা আগে-আগে নৌকোয় উঠে গেলে কী করে!"

আমি বললাম, "বা রে, আমি কী করে জানব যে, তুমি উঠতে পারোনি।"

চন্দোরকাকু বলল, "আসলে সামপানের উচিত ছিল আমার হাত ধরে নৌকোয় তুলে নেওয়া।"

মুন্নি বলল, "তুমি মোটা বলে আমাদের সঙ্গে উঠতে পারোনি।"

চন্দোরকাকু কোমরে বেল্ট কষতে কষতে বলল, "মুন্নি, বাজে কথা বোলো না।"

মুন্নি চুপ করে গেল।

বুড়্ঢাদা বলল, "সামপান, চন্দোরকাকুকে বসার জায়গা দে।"

আমরা বাসের লম্বা সিটে সরে বসে বসে চন্দোরকাকুকে জায়গা করে দিলাম। চন্দোরকাকু সিটে বসতে-বসতে বলল, "এই জন্যেই ছেলেছোকরাদের সঙ্গে কোথাও আসতে নেই।"

"তা হলে তুমি না এলেই পারতে চন্দোরকাকু।" আমি আলগোছে বললাম!

চন্দোরকাকু রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, "তাহলে তো সাপের পাঁচ পা দেখতিস তোরা।"

নৌকোর সেই দাড়িঅলা, গগ্‌লস-পরা

লোকটা আমাদের দিকে তাকিয়ে তখনো মিটিমিটি করে হাসছে। বাসে যাকে বলে তিলধারণের স্থান নেই।

সামপানদা বলল, "এ-বাসটা মিস্ করলে আর বাস ছিল না। তখন হাঁটা ছাড়া আর নট কিছু।"

ইতিমধ্যে বাস ছেড়ে দিয়েছে। বাসের বেশির ভাগ যাত্রীই স্থানীয় লোকজন। তারা নানারকম কথাবার্তা বলছে নিজেদের মধ্যে।

দাড়িঅলা লোকটা আমাদের উদ্দেশ করে বলল, "আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ফ্রেজারগঞ্জ পৌঁছে যাব।"

বুড়ঢাদা বলল, "জানিস মুন্নি, ফ্রেজারগঞ্জের আগের নাম ছিল নারায়ণতলা দ্বীপ। জাহাজের নাবিকরা বলত মেকলেনবার্গ।"

আমি বললাম, "এর নাম ফ্রেজারগঞ্জ কী করে হল বুড়ঢাদা?"

বুড়ঢাদা বলল, "স্যার অ্যানড্রু ফ্রেজার যখন বাংলার গভর্নর ছিলেন তখন উনি এই জায়গাটাকে কলকাতার লোকদের বায়ুপরিবর্তনের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন। তাঁরই নাম অনুসারে নারায়ণতলা দ্বীপের নতুন নাম ফ্রেজারগঞ্জ।"

চন্দোরকাকু বলল, "আমরা বকখালিতে না নেমে ফ্রেজারগঞ্জেও তো নেমে পড়তে পারি। ভারী সুন্দর নাম ফ্রে-জা-র-গ-ঞ্জ।"

চন্দোরকাকুর কথায় মুখ টিপে হাসতে থাকি। আসলে স্কারলেট আইবিস নামের সারসজাতীয় বক খুঁজতেই তো আমাদের বকখালি আসা।

দাড়িঅলা লোকটা আগ বাড়িয়ে বুড়ঢাদাকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি এর আগে ফ্রেজারগঞ্জ এসেছেন?"

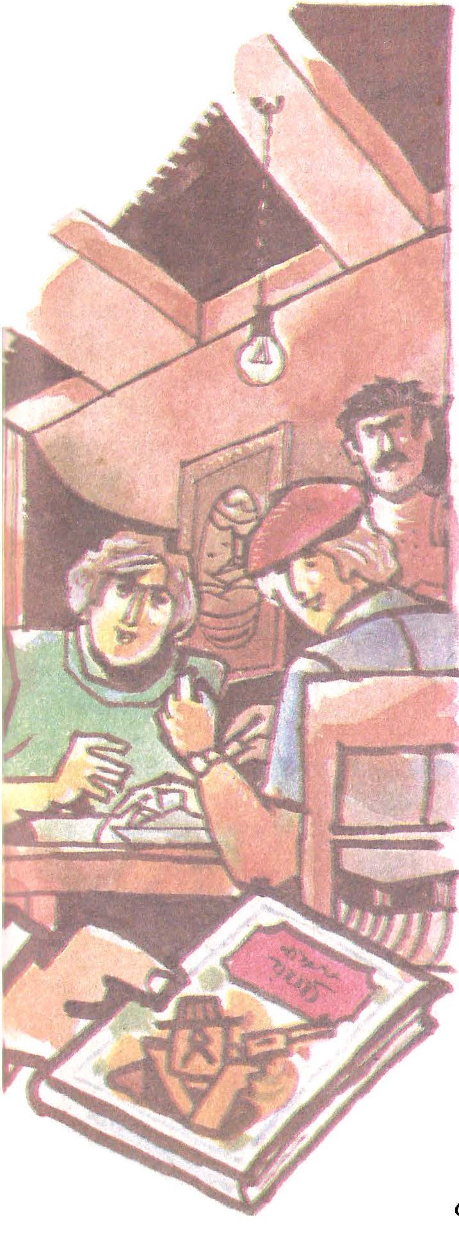

বুড়োদা উদাসীনভাবে বলল, "যতদিন পৃথিবীতে বই থাকবে, আমার কোথাও যাবার দরকার নেই।" তারপর স্বগতোক্তির মতো বলল, "ফরেস্ট রেঞ্জার্স অফিস, বাংলো, নারকেল-বাগান, ঝাউবন, ব্রহ্মময়ী কালী, প্রবর্তক আশ্রম, সরকারি পোর্ট কমিশনের অফিস, উত্তর বকখালির বনদেবী, মাছের আড়ত, শ্রীশ্রীরামসীতার আশ্রম, পাশে জম্বুদ্বীপ ও নুথিয়ান দ্বীপ।"

বুড়োদা অবাক করে দেবার মতো সব বলে গেলে দাড়িঅলা লোকটার চোখ বড় বড় হয়ে যায়। তারপর বলে, "আরে হ্যাঁ, সবই তো মিলে যাচ্ছে, কী করে জানলেন আপনি ?"

এমন সময় বাস এসে ফ্রেজারগঞ্জে থামল। দূরে সমুদ্রপারে বাঁধ দেখা যাচ্ছে।

বুড়োদা বলল, "রোজই কিছু-কিছু করে ফ্রেজারগঞ্জের জমি সমুদ্র গ্রাস করে নিচ্ছে। সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেঙে যাচ্ছে বড় বড় বাঁধ।"

বাসের সেই দাড়িঅলা লোকটা ফ্রেজারগঞ্জে নেমে গেল। নামার আগে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলে গেল, "চলি, আবার দেখা হবে।" বাসের প্রায় সবাই নেমে গেল। বাস প্রায় খালি। আমরা কয়েকজন শুধু এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছি।

বুড়োদা বলল, "সমুদ্রের পার দিয়ে হেঁটে গেলেও আমরা বকখালিতে পৌঁছে যেতে পারি।"

একটু পরেই বকখালিতে এসে বাস থামল। আমরা হৈহৈ করে নেমে পড়ি। দূরে টুরিস্ট লজের বিশাল বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। বাঁ দিকে ফরেস্ট। ফরেস্টের শুরুতেই ফরেস্ট রেঞ্জারের কাঠের বাংলো।

বুড়োদাদা ফরেস্টের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "সুন্দরবনের রেঞ্জের শুরু কিন্তু এখান থেকেই।"

মুন্নি বলল, "চলো না, সুন্দরবনের সুন্দরী গাছ দেখে আসি।"

"না না, এখন নয়।" চন্দোরকাকু হামলে উঠল। "পরে খেয়ে-দেয়ে এদিকে আসা যাবে।"

আমরা রেঞ্জারসাহেবের বাংলো বাঁ পাশে রেখে কালভার্ট পেরিয়ে টুরিস্ট লজের দিকে এগিয়ে যাই। পিচের রাস্তাটা এঁকে-বেঁকে টুরিস্ট লজের দিকে চলে গেছে সোজা। টুরিস্ট লজ পেরিয়ে চলে গেছে সমুদ্রে।

হাঁটতে হাঁটতেই বুড়োদাদা বলল, "সুন্দরী গাছের জন্যই যে সুন্দরবনের নাম সুন্দরবন হয়েছে, এটা কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট নয়। সুন্দরবনের পুব দিকে সুন্দরী গাছ প্রায় নেই বললেই চলে। আসলে সমুদ্রতীরবর্তী বন বলেই এ-বনের নাম সমুদ্র-বন বা সমুন্দর-বন। এর থেকেই নাম হয়েছে সুন্দরবন।"

সামপানদা বলল, "আশ্চর্য তো, এতদিন আমরা অন্যরকম জানতাম।"

টুরিস্ট লজের সামনে লোহার গেট। লোহার গেট পেরুলেই মাঠ। মাঠের দু'পাশে ফুলের বাগান। বাঁ পাশে একটা ঝিল। ঝিলে টলটলে জল। ঝিলের গায়েই একটা ছোট্ট দোলনা। জলের ধারে ছোট্ট একটা নৌকো বাঁধা। ঝিলের লাগোয়া বিশাল এক হলঘরের মধ্যে টুরিস্টদের খাওয়ার জায়গা। হলঘরে সারি-সারি টেবিল। হলঘরের জানলার ধারে এলাচফুলের লতানো ঝাড় আর কাঁটাঝোপের ছায়া। গেটের ডান পাশে দুটো আট-সিটের ডরমেটরি। তারই গায়ে সারি-সারি টু-সিটেড রুম। নতুন হয়েছে।

টুরিস্ট লজের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতেই আমরা আট-সিটের একটা ঘর পেয়ে গেলাম। সাদা চাদর মোড়া গদিঅলা আটটা বিছানা।

চন্দোরকাকু ঘরে ঢুকেই জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করে দিল।

সামপানদা আমাকে বলল, "তেল মেখে নে কাবুল, সমুদ্রে স্নান করতে যাব।"

মুন্নি বলল, "আমিও যাব স্নান করতে।"

চন্দোরকাকু বলল, "মুন্নি, তুমি সমুদ্রে স্নান করতে যেয়ো না। তুমি ছোট্ট মেয়ে, এখানকার বাথরুমে স্নান করো।"

তাই শুনে মুন্নি নাকিকান্না জুড়ে দিল।

চন্দোরকাকু রাগ করে বলল, "আচ্ছা বাবা, তুই যাস, কিন্তু কোনো অঘটন ঘটলে কিন্তু আমি জানি না।"

বুড়োদাদা জুতো খুলেই বিছানায় টান-টান হয়ে শুয়ে পড়তে-পড়তে বলল, "মার্ভেলাস।"

ঠিক সেই সময় আমাদের ঘরে সাদা উর্দি-পরা বেয়ারা ঢুকল। ওর হাতে একটা প্লাসটিকের ওয়াটার-জাগ ও গোটা কয়েক কাচের গ্লাস।

২

ক্যাজুরিনার ছায়ায় মোড়া বকখালির সমুদ্রপারটি যেন সবুজ আর রুপোলি মেশানো একটি বাইকালার ছবি। সুবোধ বালকের মতো শান্ত সমুদ্র। অনেক দূর পর্যন্ত সবুজ ঝাউগাছের সারি। বাতাস ভারী দামাল এখানে। ঝাউগাছের গোড়া সমুদ্রের ভিতর পর্যন্ত নেমে গেছে। সমুদ্রের নির্জন পারে ছড়িয়ে আছে পাথরের টুকরো।

মুন্নি একটা বাটির মতো পাথরের টুকরো হাতে নিয়ে বলল, "দ্যাখ্ দাদা,

একেবারে বাটির মতো। এটাকে অ্যাশট্রে বানালে কেমন হয়।"

"দারুণ। একেবারে প্রাকৃতিক অ্যাশট্রে।"

"বাবাকে কলকাতায় গিয়ে প্রেজেন্ট করব।"

আমরা দু' ঘণ্টা সমুদ্রস্নান করে যখন টুরিস্ট লজে ফিরলাম, তখন প্রায় সব টুরিস্টদের দুপুরের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। লাউঞ্জ প্রায় ফাঁকা। এক কোণে দুজন সুইডিশ সাহেব বসে-বসে খাচ্ছে। খাবার ফাঁকে-ফাঁকে ছোট্ট নোট-বুকে কীসব লিখছে। ডাল দিয়ে ভাত মেখে আলুভাজা দিয়ে খাচ্ছে। সাহেব দুটির বয়স বেশি নয়। আমি তাদের সঙ্গে গিয়ে আলাপ করলাম। দুজনেই ছাত্র। ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। ছুটিতে বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়েছে। বেনারস থেকে কলকাতা এসেছে। কলকাতা থেকে বকখালি। বকখালি থেকে সোজা চলে যাবে নেপালে। ওরা আমাদের কাঁটা বেছে বেছে মাছ খাওয়া দেখছিল অবাক হয়ে।

আমাদের খাওয়া শেষ হয়-হয়, ঠিক এমন সময় একটি লোক ঢুকল লাউঞ্জে। লোকটির অতি সাধারণ চেহারা। গায়ে একটা নীল রঙের শার্ট, পরনে হাঁটু পর্যন্ত তোলা ময়লা ধুতি।

লোকটি সোজা চন্দোরকাকুর কাছে গিয়ে বলল, "মুরগি নেবেন বাবু?"

চন্দোরকাকু মুরগির নামে সোজা হয়ে বসল। মুরগির নাম শুনলে চটে যায় চন্দোরকাকু। তাকে কিনা মুরগির কথা বলা!

চন্দেরাকাকু রাগ করে বলল, "মুরগি-ফুরগির কথা আমি জানি না।"

সামপানদা বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, মুরগি নেব। রাত্তিরে মুরগির ঝোল আর ভাত।"

মুন্নি বলল, "চন্দোরকাকু কী খাবে তবে! চন্দোরকাকু তো মুরগি খায় না।"

চন্দোরকাকু বলল, "আমার জন্য তোমাদের ভাবতে হবে না। তোমরা মুরগির মাংস খেয়ো, আমি ঝোল খাব।"

সামপানদা স্লোগান দেবার ভঙ্গিতে বলল, "চ-ন্-দো-র-কাকু..."

সবাই বললাম, "যুগ যুগ জিয়ো।"

লোকটির সঙ্গে চন্দোরকাকু আলাপ করছিল। কোথায় থাকে? কী নাম?

কাছেই এক গ্রামে থাকে লোকটি। বড় গরিব। মুরগি বেচে ছেলেমেয়েদের সবাইকে খাওয়াতে পারে না। জঙ্গল সাফ করে কিছু উপরি হয় তার।

ওর কথা শুনে মুন্নির খুব কষ্ট হচ্ছিল। মুন্নি করুণ মুখে বলল, "তোমার নাম কী ভাই?"

"ঈশ্বর দাস এরণ্ড আইচ।"

সামপানদা বলল, "অদ্ভুত নাম তো তোমার!"

চন্দোরকাকু বলল, "অতবড় নামে কিন্তু তোমাকে ডাকতে পারব না। তোমাকে আমরা ডাকব আইডিয়া বলে।"

আমি বললাম, "আইডিয়া মানে!"

চন্দোরকাকু বলল, "ঈশ্বরের আই, দাসের ডি, এরণ্ডের ই আর আইচের এ।"

আমরা বললাম, "দারুণ! দি আইডিয়া!"

পরদিন ভোর না হতেই চন্দোরকাকু বাদে আমরা আর সবাই বেরিয়ে পড়লাম স্কারলেট আইবিসের সন্ধানে। সমুদ্রের পার দারুণ নির্জন। কেবল একটানা সমুদ্রের গর্জন আর ঝাউগাছে বাতাসের শব্দ। আমরা সি-বিচ ধরে ফ্রেজারগঞ্জের দিকে এগুতে থাকি। সি-বিচ লাল হয়ে

গেছে কাঁকড়ায়। আমাদের দেখে কাঁকড়াগুলো চটপট ঢুকে যাচ্ছে গর্তে।

হঠাৎ দেখি, কিছু দূরে একঝাঁক বক বসে আছে। মুন্নি দৌড়ে যায় সেদিকে। মুন্নিকে দেখে বকগুলি উড়ে যায়।

বুড়ঢাদা বকের ওড়া দেখেই বলে দিল, ওর মধ্যে স্কারলেট আইবিস নেই।

আমরা তন্ন-তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছি স্কারলেট আইবিস। আমরা চাইছিলাম, এক্ষুনি ঘোর লাল রঙের একটা বক আমাদের সামনে এসে বসুক। বুড়ঢাদার হাত থেকে খাবার খাক। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না।

বুড়ঢাদাকে কেমন গম্ভীর দেখাচ্ছে। তার সঙ্গে কথা বলতে আমাদের ভয় করছে। ইচ্ছে করছিল, বুড়দাকে দারুণ একটা মজার গল্প শোনাক কেউ। হোহো হাসিতে ফেটে পড়ুক বুড়ঢাদা।

আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি হাঁটতে হাঁটতে। হঠাৎ বুড়ঢাদা হেঁচে উঠল। কয়েক মুহূর্ত পরে আবার হাঁচল। আমরা সজাগ হয়ে উঠলাম। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে আর একটা হাঁচি। আমরা কিছু বোঝবার আগেই বুড়ঢাদা প্রায় লাফিয়ে পড়ে মুন্নিকে সরিয়ে নিয়ে এল। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "ওদিকটায় চোরাবালি আছে।"

"চোরাবালি!" চমকে উঠি আমি।

মাটি থেকে সমুদ্রে ভেসে আসা একটা গাছের ডাল নিয়ে কয়েক হাত দূরে ছুঁড়ে দেয় বুড়ঢাদা। আশ্চর্য, সবাইকে অবাক করে দিয়ে গাছের ডালটা বালির মধ্যে ডুবে যায়।

সামপানদা বলল, "চোরাবালির কথা বইয়ে পড়েছি, কিন্তু একেবারে সামনাসামনি চোরাবালি দেখা—ভাবা যায়।"

আমি বললাম, "যদি বুড়ঢাদা তিনবার না হাঁচত, তবে আজ যে কী হত, কে জানে!"

হঠাৎ আকাশ কালো হয়ে ওঠে। কোথা থেকে একরাশ মেঘ এসে আকাশে জমতে শুরু করেছে। আচমকাই বৃষ্টি শুরু হল। বুড়দাদা বলল, "চল্, ছুটে সামনের ওই পোড়োবাড়িটায় গিয়ে ঢুকে পড়ি।"

আমরা সবাই ছুটতে ছুটতে কাছেই একটা ভাঙাচোরা বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। পরিত্যক্ত বাড়ির সামনে ঝোপ। ঝোপের মাঝখান দিয়ে পায়ে-চলা পথ। চারপাশে বনবাদাড়। দেওয়ালের ইঁটে নোনা ধরে গিয়েছে। ঝুরঝুর করে পলেস্তারা ঝরে যাচ্ছে মেঝেতে।

বুড়দাদা বলল, "এখানে নাকি হার্মাদদের প্রধান আড্ডা ছিল একসময়।"

মুন্নি বলল, "হার্মাদ মানে?"

বুড়দাদা বলল, "জলদস্যুদের হার্মাদ বলা হত। কথাটা এসেছে আর্মাডা থেকে।"

মুন্নি বলল, "দ্যাখো বুড়দাদা, ঘরের দেওয়ালে একটা জানলা পর্যন্ত নেই।"

বুড়দাদা বলল, "এই ধরনের মুখ বন্ধ ঘরকেই বলে গুমঘর।"

আমি বললাম, "এই ধরনের ঘরে বিপুল ধনরত্ন থাকে, আমি বইয়ে পড়েছি। আর থাকে—"

মুন্নি বলল, "আর কী থাকে দাদা?"

"যক্ষি।"

যক্ষি বলতেই মুন্নি ভয়ে প্রায় সিঁটিয়ে গেল। তারপর বলল, "যক্ষি কী করে রে দাদা?"

"কী আর করবে, কেউ যদি ধনরত্নের লোভে এই ঘর ভাঙতে আসে, তাকে মেরে ফেলে।"

বুড়দাদা পর-পর তিনবার হ্যাঁচ্চো-হ্যাঁচ্চো করে হেঁচে উঠল। আমরা বুড়দাদার দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালাম। বুড়দাদা বলল, "এ-বাড়িটা সুবিধের মনে হচ্ছে না রে।"

তখন বৃষ্টি কমে এসেছে। বুড়দাদা বলল, "চল্ সামপান, একটু ঘুরে দেখে

আসি বাড়িটা।"

আমরা চারজন ধীর পায়ে হেঁটে যাচ্ছি বারান্দা দিয়ে। সামপানদার পা লেগে একটা ইটের টুকরো গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। বুড়োদা ফিসফিস করে বলল, "শব্দ করিস না।"

মুন্নি ফিসফিস করে বলে, "ওই দ্যাখো বুড়োদা, দূরের ওই ঘরটাতে আলো জ্বলছে।"

আমরা নিশ্বাস বন্ধ করে ওই ঘরের জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঘরের ভেতর সেই সাতসকালে ছোট্ট একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। চারদিকের গাছগাছালির জন্য ভেতরের এই ঘরে আলো ঢোকে না।

জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, ঘরে একটা ছোট্ট তক্তাপোশ পাতা। তক্তাপোশের উপর দশ-এগারো বছরের একটি ছেলে বসে আছে। ছেলেটার পরনে নীল জামা আর সাদা হাফপ্যান্ট। ছেলেটার সামনে একটা কলাই-করা থালাতে পান্তাভাত আর পেঁয়াজ। ছেলেটা গোঁজ হয়ে বসে আছে। কিছুতেই খাচ্ছে না।

ঘরের ভেতর থেকে একটা লোকের চিৎকার ভেসে আসছে। লোকটা ছেলেটাকে খেয়ে নিতে বলছে।

লোকটাকে আমরা জানলা দিয়ে দেখার চেষ্টা করছি, কিন্তু কিছুতেই দেখতে পাচ্ছি না। ঘরের এমন একটা কোণে লোকটা বসে আছে যে, এই জানলা দিয়ে কিছুতেই তাকে দেখা সম্ভব নয়।

সামপানদা বলল, "লোকটার গলার স্বরটা কেমন চেনা-চেনা লাগছে। কোথায় যেন শুনেছি।"

হঠাৎ বুড়োদা বারান্দা থেকে নেমে কী যেন খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। ঝোপের ভেতর থেকে কী যেন একটা চকচকে জিনিস কুড়িয়ে আনল বুড়োদা। তাকিয়ে দেখি, ছোট্ট একটা ভাঙা আয়নার টুকরো। আয়নার টুকরো দিয়ে কী করবে বুড়োদা? আয়নার টুকরোটা এনে ঘরের জানলার পাশে এমনভাবে রাখল, যাতে পেরিস্কোপের মতো ঘরের ভেতরটা স্পষ্ট দেখা যায়। বুড়োটা ভাঙা আয়নার ভেতর দিয়ে ঘরের ভেতর দেখে যাচ্ছে। এক সময় ইশারায় আমাকে আয়নায় চোখ দিতে বলে। আমি চমকে উঠি। বিস্ময়ে বুড়োদার মুখের দিকে তাকাই। বুড়োদা মুখে আঙুল দিয়ে চুপ করতে বলে। তারপর ডাকে সামপানদাকে। সামপানদা ফিসফিস করে বলে, "সে কী রে!" মুন্নি আব্দার করে বলল, "আমি দেখব বুড়োদা।" বুড়োদা মুন্নিকেও দেখায় আয়নার ভেতর দিয়ে।

মুন্নি আস্তে বলে ওঠে, "নৌকোর সেই দাড়িঅলা কালো-গগ্‌লস-পরা লোকটা।"

সামপানদা বলল, "কী করছে লোকটা এখানে! ওই বাচ্চা ছেলেটাই বা কে!"

এমন সময় একটা খস্‌খস্ শব্দ। বুড়োদা ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "চল্, চলে যাই এখান থেকে, কেউ এসে পড়তে পারে।"

আমরা পোড়ো বাড়িটা থেকে বেরুতেই দেখি সেই মুরগিঅলাটা আসছে।

মুন্নি বলল, "বুড়োদা, আইডিয়া আসছে।"

আমাদের দেখে আইডিয়া ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। তারপর মাথা নিচু করে বলল, "নমস্কার হই বাবুরা।"

বুড়োদা ওর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি এখানে?"

"আর বলবেন না বাবু, বৃষ্টির আগে আমার ছোট ছেলেটা এদিকে এসেছিল, ওকে খুঁজতে এসেছি।" তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, "এদিকে আসবেন না বাবু।"

বুড়োদা বলল, "কেন!"

"এখানে যক্ষি আছে।"

মুন্নি বলল, "চলো বুড়োদা, এখান থেকে চলে যাই।"

আইডিয়া বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনারা চলে যান বাবু। এখানে বেশিক্ষণ থাকবেন না।"

আইডিয়ার কথা শুনে আমরা বেরিয়ে পড়ি ওই রহস্যময় বাড়ি থেকে।

বুড়োদা কোনো কথা বলছে না। এই সময় বুড়োদাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে ভয় হয়।

সামপানদা সাহস করে জিজ্ঞেস করে, "নৌকোর সেই ফর্সা, লালজামা-পরা, দাড়িঅলা, গগ্‌লস-পরা লোকটা ছেলেধরা নয় তো?"

বুড়োদা কোনো জবাব দেয় না। কী যেন ভেবে যাচ্ছে সর্বক্ষণ।

আমরা যখন টুরিস্ট লজের গেটের সামনে পৌঁছই, তখন টুরিস্টদের ঘুম ভাঙছে একটু-একটু করে। কেবল সুইডিশ সাহেব দুটি টুরিস্ট লজের মাঠে জগিং করছে।

৩

টুরিস্ট লজে ফিরতেই চন্দোরকাকু হৈ হৈ করে উঠল। "কোথায় গিয়েছিলি তোরা সাতসকালে?"

আমি বললাম, "স্কারলেট আইবিসের সন্ধানে।"

"পেলি?"

"স্কারলেট আইবিস পাইনি, তবে খেঁকশেয়াল পেয়েছি!"

"খেঁকশেয়াল।" চন্দোরকাকু ভয়ে ভয়ে বলল, "কোথায়?"

আমরা সবাই হোহো করে হেসে উঠি। কেবল বুড়োদা কোনো কথা বলছে না।

চন্দোরকাকু পাউরুটিতে জ্যাম মাখিয়ে আমাদের খেতে দিল। আর সঙ্গে চা।

খাবার দেখে আমি বললাম, "এই না হলে চন্দোরকাকু!"

সামপানদা বলল, "চন্দোরকাকু কী করে বুঝে যায় বল্ তো আমাদের খিদে পেয়েছে।"

কেবল বুড়োদা কিছু বলল না। আমরা চাইছিলাম, বুড়োদা আজ সকালের ওই রহস্যময় বাড়ি সম্বন্ধে দু-চার কথা বলুক। ফর্সা দাড়িঅলা লোকটা কে, ওই বাচ্চা ছেলেটাই বা কোত্থেকে এসেছে, এসব বলে দিয়ে আমাদের তাক লাগিয়ে দিক। অথচ বুড়োদা কিছুই বলছে না। আমরা চাইছিলাম এক্ষুনি বুড়োদা পরপর তিনবার হেঁচে উঠুক। সমুদ্রপারের ওই পোড়োবাড়ির রহস্য জলের মতো পরিষ্কার হয়ে উঠুক আমাদের চোখের সামনে। সামপানদা বোধহয় বুড়োদাকে হাঁচাবার জন্যে নস্যি বের করল পকেট থেকে। নস্যি নাকে নিতে-নিতে যেন ইচ্ছে করেই সামপানদা একটু নস্যি উড়িয়ে দিল ঘরের ভেতর। মুন্নি হেঁচে উঠল একবার। চন্দোরকাকুও হাঁচল। বুড়োদাও। বুড়োদা হাঁচতেই আমরা সজাগ হলাম। বুড়োদা আবার হাঁচল। বুড়োদা দু'বার হেঁচেছে। আমাদের তিন জোড়া চোখ বুড়োদার দিকে। বুড়োদা আর একবার হাঁচলেই দারুণ একটা কিছু বলে চমকে দেবে আমাদের। অথচ বুড়োদা আর হাঁচে না। দু'বার হেঁচেই একেবারে চুপ মেরে যায়।

বুড়োদা হঠাৎ বলল, "জানিস কাবুল, ওই ফর্সা দাড়িঅলা লোকটাকে আমার সুবিধার মনে হচ্ছে না।"

আমি বললাম, "ঘরে বসে থাকা ওই ছেলেটাকেও বড় চেনা লাগছে আমার।"

মুন্নি বলল, "হ্যাঁ, আমারও। কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে ছেলেটাকে।"

সামপানদা বলল, "ছেলেধরা নয় তো? দাড়িঅলা ফর্সা লোকটা হয়তো ছেলেটাকে ধরে এনেছে কোথা থেকে।"

বুড়োদা বলল, "ঠিকই ধরেছিস। আমিও তাই ভাবছি সকাল থেকে।"

মুন্নি জিজ্ঞেস করল, "পুলিশে খবর দেবে না?"

বুড়োদা বলল, "আগে স্যাঙ্গুইন হয়ে নিই, লোকটা সত্যিই ছেলেধরা কিনা।"

আমরা খাবার ঘরে দুপুরে খাওয়া সারছিলাম। তখন অন্য টুরিস্টদের খাওয়া হয়ে গিয়েছে। ফাঁকা লাউঞ্জে আমি, চন্দোরকাকু, সামপানদা আর বুড়োদা। তখনও মুন্নি এসে পৌঁছয়নি। আমাদের খাওয়া হয়ে গিয়েছে প্রায়। এমন সময় মুন্নি ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। মুন্নির ভেজা চুল দিয়ে তখনো টপ্‌টপ্‌ করে জল পড়ছে।

চন্দোরকাকু মুন্নিকে ধমকে দিল একটু, "তোর স্নান করতে বড় বেশি সময় লাগে মুন্নি।"

যারা খাবার সার্ভ করছিল, বুড়োদা খেতে খেতে তাদের কাছে সেই মুরগিঅলার খোঁজখবর নিচ্ছিল। কেউ ওর সম্বন্ধে খারাপ কিছু বলল না। তবে সে যে বড় গরিব, এ-কথা সবাই বলল।

আমরা শেষ পাতে চাটনি খাচ্ছিলাম। মুন্নি সবে ডালভাত খাচ্ছে আলুভাজা দিয়ে। এমন সময় হঠাৎই মুন্নি এক গ্রাস

ভাত নিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "বুড়ঢাদা !" বলেই এঁটো-হাতে উঠে দাঁড়াল। চোখে-মুখে দারুণ উত্তেজনা।

আমরা সবাই তখন খাবার টেবিল থেকে উঠব-উঠব করছি। প্রত্যেকে চমকে মুন্নির দিকে তাকালাম। মুন্নির চোখ-মুখ খুশিতে চক্‌চক্ করছে।

চন্দোরকাকু বলল, "কী হল রে মুন্নি ?"

মুন্নি বলল, "পোড়োবাড়ির ওই ছেলেটাকে চিনে ফেলেছি বুড়ঢাদা।"

বুড়ঢাদা অবাক হয়ে বলল, "সে কী, কে ছেলেটা !"

মুন্নি বলল, "টিভিতে দেখেছি সপ্তাহখানেক আগে।"

সামপানদা বলল, "টিভিতে ?"

"হ্যাঁ, টিভিতে হারিয়ে যাওয়া লোকের ছবি দেয় না ? সেখানে দেখেছি। ছেলেটার জ্বলজ্বলে ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠছে বারবার।"

চন্দোরকাকু বলল, "এক্ষুনি পুলিশে খবর দেওয়া দরকার।"

আমি বললাম, "টিভিতে ছেলেটার ছবি আমিও দেখেছি মনে হচ্ছে ?"

হঠাৎ বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো একটা টেলিফোন-নম্বর মনে এল আমার। প্রায় চেঁচিয়ে বলে ফেললাম নম্বরটা।

চন্দোরকাকু বলল, "সে আবার কী !"

বললাম, "টেলিফোন নম্বর।"

চন্দোরকাকু বলল, "কার ?"

"ছেলেটার ছবির তলায় এই ফোন নম্বর ছিল।"

মুন্নি বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছেলেটার ঠিকানার নীচে এই ফোন-নম্বরটাই ছিল।"

বুড়ঢাদা ইশারায় সবাইকে আস্তে কথা বলতে বলল। তারপর ফিসফিস করে বলল, "কিন্তু এখানে তো কোনো টেলিফোন নেই। টেলিফোন করতে হলে যেতে হবে সেই নামখানায়।"

চন্দোরকাকু বলল, "এখানে ইলেকট্রিকই নেই, তার আবার টেলিফোন।"

সামপানদা বলল, "তবে আমি থানায় খবর দিয়ে আসি।"

বুড়ঢাদা বলল, "এক্ষুনি নয়। ছেলেটার বাবা-মাকে আগে খবর দেওয়া দরকার। কাল সকালেই।"

চন্দোরকাকু বলল, "পুলিশে খবর না দেওয়াটা কিন্তু খুব খারাপ হচ্ছে।"

সেদিন রাতে আমাদের কারুরই ঘুম ছিল না। শুধু চন্দোরকাকু ছাড়া। স্কারলেট আইবিসের খোঁজে এসে ছেলেধরার দল ধরে ফেলার সুযোগ আসবে, এটা আমরা কেউ ভাবিনি। টেবিলের উপর হ্যারিকেনের আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। চন্দোরকাকুর নাক ডাকার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে শুধু। বুড়ঢাদা ঘুমোচ্ছে না, বোঝাই যাচ্ছে। আমার চোখে ঘুম নেই। কেবলই মনে হচ্ছে, কখন ভোর হবে। বুড়ঢাদার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দৌলতে ছেলেধরার দল ধরা পড়ুক, এটাই চাইছিলাম। পরশুদিনের সব খবরের কাগজে বুড়ঢাদার সঙ্গে ছেলেধরা-দলের রিং-লিডারের ছবি বেরুবে। সঙ্গে আমাদেরও।

পরদিন ভোরেই বুড়ঢাদার সঙ্গে প্রথম বাসে নামখানা চলে যাই ফোন করতে। বেরুবার আগে সামপানদাকে বলল, "সামপান, আমরা ফিরে আসি, তারপর তুই পুলিশে খবর দিবি।"

আমি আর বুড়ঢাদা বাসে করে হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদীর এপারে নামলাম। তারপর নৌকো করে ওপারে। পোস্ট অফিসের কথা বলতেই লোকে

লাইফবয় যেখানে স্বাস্থ্যও সেখানে

সারাদিন ধরে খাটুনীর পরে…কিম্বা প্রচণ্ড হুটোপাটি করে খেলাধূলোর পরে, লাইফবয় দিয়ে স্নানের মজাই আলাদা! এ আবার আপনার মাঝে জাগিয়ে তোলে — এক সাফ আর সুস্থ অনুভূতি!

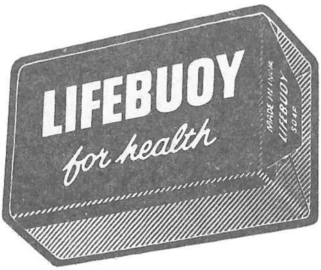

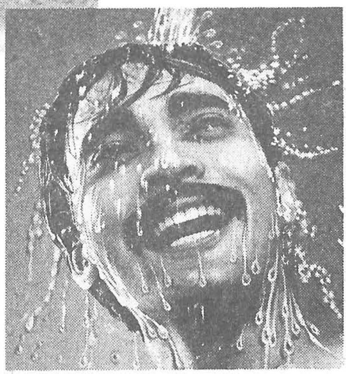

লাইফবয় ধূলোময়লার রোগজীবাণু ধুয়ে দেয়

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

LINTAS L 88 159 BG

লাল একটা বাড়ি দেখিয়ে দিল। টেলিফোন আছে সেখানে।

বুড়ঢাদা টেলিফোনে খুব চাপা গলায় কথা বলছে। কলকাতায় টেলিফোন করছে বুড়ঢাদা। পাশে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনতে পাচ্ছি আমি।

"আমি বকখালি থেকে বলছি।"

... ...

"আপনার ছেলেকে এখানে এক বাড়িতে এনে আটকে রাখা হয়েছে।"

... ...

"আপনারা এক্ষুনি এখানে চলে আসুন। এখানে এলে হয়তো আপনাদের ছেলেকে পেয়ে যেতে পারেন। আমরা বকখালি বাস-স্টপে আপনাদের জন্য বেলা বারোটা থেকে অপেক্ষা করব।"

আরো দু' একটা কথা বলে টেলিফোন ছেড়ে দেয় বুড়ঢাদা। তাকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছে।

বুড়ঢাদা বলল, "বুঝলি কাবুল, মাসখানেক হল ওদের ছেলে হারিয়ে গেছে। ছেলেধরারা চিঠি দিয়েছে, সামনের শনিবার ঠিক দুপুর দুটোর সময় মিউজিয়ামের সামনে কুড়ি হাজার টাকা নিয়ে উপস্থিত থাকতে। ফর্সা, দাড়িঅলা, লালজামা এবং গগ্‌লস-পরা লোক চাইলেই তাকে টাকাটা দিয়ে দিতে হবে। টাকাটা আনতে হবে কালো ব্রিফকেসে। আর টাকা দেবার আধ ঘণ্টা পরে মেট্রো সিনেমার বুকিং অফিসের সামনে ছেলেকে ফিরে পাবে।"

আমি ফিসফিস করে বললাম, "বুড়ঢাদা, ফর্সা, দাড়িঅলা, গগ্‌লস-পরা লোক!"

"হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছিস।"

"এখন আমরা কী করব বুড়ঢাদা?"

"আমাদের সন্দেহ যে অমূলক নয়, এটা প্রমাণিত হল। এখন শুধু অপারেশন।"

আমি বললাম, "অপারেশন বকখালি।"

বুড়ঢাদা হাসতে হাসতে বলল, "দেখিস, সব ভণ্ডুল করে দিস না। আমাদের খুব সাবধানে এগুতে হবে এখন।"

আমরা ফিরে এলাম বকখালিতে। সামপানদাকে বুড়ঢাদা বলল, "সামপান, ছেলেটার বাবা-মা এখানে এলেই তুই পুলিশে খবর দিবি।"

সামপানদা বলল, "ওই ছেলেটার বাবা-মা যদি ওরা না হয়।"

বুড়ঢাদা বলল, "তা কী করে হবে, আর-একটা ক্লু আমরা পেয়ে গেছি। যারা আসছে তারা ওই ছেলেটিরই বাবা-মা।"

চন্দোরকাকু বলল, "আমার এসব ভাল লাগছে না একেবারে। স্কারলেট আইবিসের কী হল?"

বুড়ঢাদা লিডারের ভঙ্গিতে বলল, "আমি আর কাবুল থাকব বাস স্ট্যাণ্ডে, ছেলেটার বাবা-মার জন্য অপেক্ষা করব। মুন্নি ওই পোড়োবাড়িটা চেনে। তাই ও চন্দেরকাকুকে নিয়ে সমুদ্রের পারে বেড়াবে। বেড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে বাড়িটার দিকে লক্ষ রাখবে।"

চন্দোরকাকু ভয়ে ভয়ে বলল, "না, না, আমি ওসব গোয়েন্দাগিরির মধ্যে নেই। পুলিশকে খবর দিলে কত ভাল হত—যত্তোসব ঝুটঝামেলা।"

মুন্নি বলল, "কী বলছ চন্দোরকাকু, এ রকম একটা ছেলেধরা দলকে ধরে ফেলার কৃতিত্বটা কখনও হাতছাড়া করতে আছে! পুলিশকে বললে পুলিশই কৃতিত্বটা নেবে।"

চন্দোরকাকু বলল, "যা খুশি হোক গে,

আমাদের কী, আমার এসব ভাল লাগে না।"

মুন্নি বলল, "তুমি তা হলে টুরিস্ট লজেই থাকো। আমি বুড়ঢাদার সঙ্গে বাসস্ট্যাণ্ডে যাচ্ছি।

চন্দোরকাকু বলল, "তাই ভাল। আমি এখানেই থাকছি। তবে কিছু একটা হলে কলকাতায় গিয়ে মুখ দেখাব কী করে।"

সামপানদা বলল, "মুখ দেখাতে হবে না চন্দোরকাকু। তুমি সব সময় মুখ ঢেকে থাকবে।"

আমরা সবাই হো হো করে হেসে উঠলাম।

চন্দোরকাকু রাগ-রাগ মুখে বলল, "চোপ।"

বুড়ঢাদা ইশারা করে মুন্নিকে চন্দোরকাকুর সঙ্গে টুরিস্ট লজেই থাকতে বলল।

আজকেও আমরা তাড়াতাড়ি স্নান করে খেয়ে নিলাম। টুরিস্ট লজের কেউ জানে না, আজ এই বকখালিতে দারুণ একটা ঘটনা ঘটতে চলেছে। রোজকার মতোই বকখালি শান্ত, স্বাভাবিক। টুরিস্ট লজের পুকুরে নৌকা চালাচ্ছে দু'চারজন ছেলেমেয়ে। একটা সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে আপন মনে দোলনায় দোল খেয়ে যাচ্ছে। সাহেব দুজন বকখালির নানা জায়গার ছবি তুলে যাচ্ছে শুধু। ক্যামেরায় শব্দ উঠছে ক্লিক, ক্লিক। আমার আর মুন্নির ছবি তুলে নিল তারা। আর সঙ্গে সঙ্গে ছবির প্রিন্ট হয়ে গেল। একেবারে রঙিন। মুন্নির কামিজের সবুজ কলাপাতা রং হুবহু উঠে গেছে ছবিতে। চন্দোরকাকু তো একেবারে থ। সুইডিশ সাহেব দুটির সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে ভাব জমিয়ে ফেলল চন্দোরকাকু। এতবড় একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে বকখালিতে, সে-ব্যাপারে যেন চন্দোরকাকুর মাথাব্যথা নেই। চন্দোরকাকু সাহেব দুটিকে নারকোল-নাড়ু খেতে দিল।

অথচ আমরা উত্তেজনায় ভরপুর। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই দারুণ কিছু একটা ঘটে যাবে? বিরাট একটা ছেলেধরা-দল ধরা পড়ে যাবে এখানে এই বকখালিতে। সেই কৃতিত্বের দাবিদার বুড়ঢাদা অ্যাণ্ড হিজ পার্টি। কাগজে ছবি বেরুবে বুড়ঢাদার। সঙ্গে আমাদেরও। কোন্ শার্ট আর ট্রাউজার পরলে ছবিতে দারুণ দেখাবে, কীভাবে দাঁড়ালে সত্যিই মনে হবে একজন সাহসী কিশোর, এই চিন্তাই মন জুড়ে ছিল।

তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নেবার জন্য আমাদের মধ্যে হুটোপুটি লেগে গেল। চারটে বাথরুমে আমরা চারজন ঢুকে পড়লাম স্নান করতে।

স্নান সেরে ঘরে ঢুকে দেখি চন্দোরকাকু জিনিসপত্র গুছোচ্ছে আর আপন মনে বিড়বিড় করে কী যেন বলছে। চন্দোরকাকু কী বলছে আমি কান খাড়া করে শোনবার চেষ্টা করি। ভাসা-ভাসা যে কথাগুলো কানে এল তা এ রকম : এল বকের খোঁজে, পড়ল উটকো ঝামেলায়।

বুড়ঢাদা কোনো কথা বলছে না। কী যেন ভেবে যাচ্ছে শুধু। বুড়ঢাদা পুরো অপারেশনটা বোধহয় ছকে নিচ্ছে শেষবারের মতো। আমার বুকের মধ্যে কেমন গুড়গুড় করছে। আমাদের কাছে কোনো অস্ত্র-টস্ত্র নেই, যদি ছেলেধরার দল গুলি-টুলি চালায়! মনের কথা কাউকে বুঝতে দিই না। তবে আমার চোখ-মুখ দেখে বুড়ঢাদা বলল, "কী রে কাবুল, ভয় করছে নাকি রে!"

আমি কোনো উত্তর দিই না।

চন্দোরকাকু তখনো বিড়বিড় করে যাচ্ছে।

সামপানদা মজা করে চন্দোরকাকুকে জিজ্ঞেস করল, "চন্দোরকাকু, তুমি থানায় যেতে পারবে?"

চন্দোরকাকু রেগে গিয়ে বলল, "এই আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তোমাদের সঙ্গে আর কখনও কোথাও বেড়াতে যাব না।"

৪

আমি আর বুড়্ঢাদা যখন বকখালির বাসস্ট্যাণ্ডে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন সূর্য ঠিক মাথার উপরে। রাস্তাঘাট ফাঁকা। রাস্তার পাশে পাইস-হোটেলগুলোতে দু'একজন লোক বসে ভাত খাচ্ছে। যতদূর দেখা যায়, ফ্রেজারগঞ্জ পর্যন্ত রাস্তায় কোনো লোকজন নেই। ফরেস্ট রেঞ্জারের বাড়ির পাশে উঁচু-উঁচু ইউক্যালিপটাস গাছের পাতা বাতাস লেগে দোল খাচ্ছে। বাতাসে ভেসে আসছে ইউক্যালিপটাসের গন্ধ। বাসস্ট্যাণ্ডে কেবল আমরা দুজন। বুড়্ঢাদাকে আজ দারুণ দেখাচ্ছে। সাদা ইজিপশিয়ান গেঞ্জির নীচে কালো প্যান্ট। আমি পরেছি লাল ডোরাকাটা শার্টের সঙ্গে নীল রঙের জিনস।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরেও কোনো বাস আসছে না ফ্রেজারগঞ্জের দিক থেকে। আমি উশখুশ করছি। অথচ বুড়্ঢাদার কোনো উত্তেজনা নেই। যেন কী ঘটবে সব জানা আছে তার।

হঠাৎ দেখি একটা সবুজ রঙের বাস এগিয়ে আসছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বাসটা বকখালির বাসস্ট্যাণ্ডে এসে থামল। কোটপ্যান্ট-পরা একজন ভারিক্কি চেহারার লোক প্রথম নামলেন বাস থেকে। তাঁর পিছনে এক ভদ্র-মহিলা। ভদ্রমহিলার দুটো চোখ লাল। কাঁদতে-কাঁদতেই বাস থেকে নামছেন উনি।

বুড়্ঢাদা কনুই দিয়ে আমাকে খোঁচা মেরে ফিসফিস করে বলল, "ওঁরাই বোধহয় ওই ছেলেটির বাবা-মা।"

বুড়্ঢাদা ভদ্রলোকটির দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, "আমার নাম বুড়্ঢা। আপনাকে ফোন করেছিলাম আমিই।"

ভদ্রমহিলা কান্না-কান্না গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় বাবা, আমার ছেলে?"

বুড়্ঢাদা ইশারায় চুপ করতে বলল। কাছেপিঠেই হয়তো ছেলেধরা-দলের কেউ আছে।

আমরা একসঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে টুরিস্ট লজের দিকে এগুচ্ছি। বুড়্ঢাদা ভদ্রলোককে উদ্দেশ করে বলল, "আপনাদের ছেলে কি না, তা কিন্তু আমরা এখনও জানি না।"

ভদ্রমহিলা বললেন, "অনেক জায়গায় তো যাচ্ছি, কিন্তু আমার ছেলে বলে যাকে-তাকে দেখাচ্ছে।"

বুড়্ঢাদা গম্ভীর হয়ে বলল, "দেখুন তো একবার। না হলে শনিবার মিউজিয়ামের সামনে গিয়ে টাকা দিয়ে ছেলেকে নিয়ে আসবেন।" তারপরই আচমকা জিজ্ঞেস করল, "আপনার ছেলের নাম কী?"

ভদ্রমহিলা বললেন, "রণ্টি। ভাল নাম নীলাঞ্জন।"

বলেই ভদ্রমহিলা আবার কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

আমি বুড়্ঢাদার হাতে ছোট্ট করে একটা চিমটি কাটলাম। মনে পড়েছে, টিভিতে এই নামই বলেছিল।

আমরা টুরিস্ট লজের কাছে পৌঁছে গেছি। হঠাৎ দেখি টুরিস্ট লজের গেট খুলে খালি-গায়ে একজন বেরিয়ে যাচ্ছে

মতি নন্দী
এবং
খেলার পৃথিবী

মতি নন্দী এমন এক জগৎ নিয়ে লিখেছেন কয়েকটি অসামান্য গল্প এবং উপন্যাস, যে-জগতের মাত্র একটা দিকই আমরা জানতাম এতকাল। খেলার মাঠ আর খেলোয়াড়দের নিয়ে লেখা তাঁর এই সব লেখায় তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন সম্পূর্ণ অদেখা এক জগৎ। ক্রিকেট নিয়ে 'ননীদা নট আউট', ফুটবল নিয়ে 'স্ট্রাইকার' ও 'স্টপার', সাঁতার নিয়ে 'কোনি' এবং ক্রিকেট ও টেনিস নিয়ে লেখা নতুন বই 'অপরাজিত আনন্দ' আর খেলা নিয়ে যাবতীয় গল্পের সংগ্রহ 'এম্পিয়ারিং' এমন-সব নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করে দেয় আমাদের যে, সম্পূর্ণ নতুন চোখে দেখতে শিখি আমরা খেলার জগৎকে তথা মানুষের জীবনকে।

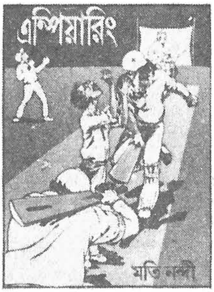

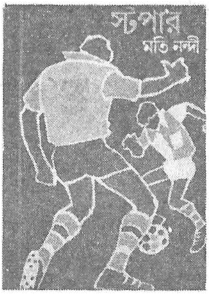

মতি নন্দীর বই

ননীদা নট আউট ৬·০০
এম্পিয়ারিং ১০·০০
স্ট্রাইকার ৮·০০
স্টপার ১২·০০
কোনি ৮·০০
অপরাজিত আনন্দ ১২·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯, ফোন : ৩৪৪৩৬২

সন্দেহজনক ভাবে।

আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম, "বুড়োদা, আইডিয়া!"

"কোথায়?"

"ওই যে পালিয়ে যাচ্ছে।"

বুড়োদা বলল, "কাবুল, তুই ওঁদের নিয়ে টুরিস্ট লজে যা, আমি এক্ষুনি আসছি।"

বলেই ছুটে বেরিয়ে যায় বুড়োদা।

ভদ্রমহিলাটি বারবার বলছেন, "আমার রন্টি কোথায়? আমাকে রন্টির কাছে নিয়ে চলো।"

ভদ্রলোকটি আপনমনে সিগারেট খেয়ে যাচ্ছেন শুধু। কোনো কথা বলছেন না।

এমন সময় বাইরে একটা চিৎকার চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে। ঘরের বাইরে এসে দেখি বুড়োদা মুর্গিঅলা আইডিয়াকে টেনে নিয়ে আসছে।

আইডিয়াকে ধাক্কা দিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে দিল বুড়োদা। ঘরের ভেতরে আমি, চন্দোরকাকু, মুন্নি আর সেই ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা। সামপানদা থানায় গেছে।

বুড়োদা ধমকে আইডিয়াকে বলল, "কী রে, আমাদের দেখে পালাচ্ছিলি কেন? খবর দিতে যাচ্ছিলি?"

"না তো।"

"ফের মিথ্যে কথা?"

"সত্যি কথাই বলছি বাবু।"

"দাঁড়া মজা টের পাবি। পুলিশে খবর দিয়েছি। তোদের সব কাণ্ডকারখানা আমার জানা।"

পুলিশের কথা শুনেই আইডিয়া একেবারে ভেঙে পড়ল। হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠে বলল, "পুলিশে খবর দেবেন না বাবু, আমি আপনাদের সব বলছি।"

বুড়োদা গম্ভীর গলায় বলল, "বল্।"

চন্দোরকাকু গোল-গোল চোখে সব কিছু দেখছিল। শান্ত বকখালিতে এরকম অশান্ত কাণ্ডকারখানা তার ভাল লাগছিল না বোধহয়।

লোকটা বলতে থাকে, "আমি বড় গরিব বাবু। আমার বাড়িতে চার ছেলে-মেয়ে আর বউ। মুর্গি আর কত বিক্রি হয় এখানে! শুধু মুর্গি বেচে যা হয়, তাতে তাদের খেতে দিতে পারতাম না দু'বেলা পেট ভরে। তাই ফর্সা, দাড়িঅলা লোকটা বলতেই কেমন রাজি হয়ে গেলাম। সমুদ্রপারের ঐ পোড়োবাড়িতে মাঝে-মাঝেই নানারকম ছেলে ধরে নিয়ে আসত লোকটা। আমার কাজ ছিল, যে-ছেলেগুলোকে ধরে নিয়ে আসত, তাদের দু'বেলা খেতে দেওয়া।"

ভদ্রমহিলা কাঁদো-কাঁদো মুখে বললেন, "তুমি ওদের কী খেতে দিতে বাবা?"

আইডিয়া চুপ করে থাকে।

বুড়োদা বলল, "বল্, কী খেতে দিতিস?"

"পান্তাভাত আর পেঁয়াজ।"

"সে কী। রন্টি তো পান্তাভাত খেতেই পারবে না!" কান্নায় ভেঙে পড়লেন রন্টির মা।

"ওই দাড়িঅলা লোকটা কোথায় থাকে? দলেই বা কে কে আছে আর?" বুড়োদা ধমকে উঠল আবার।

আইডিয়া বলল, "আমি কিছুই জানি না। ওকে ছাড়া আমি আর কাউকেই দেখিনি এখানে।"

ভদ্রমহিলা বললেন, "চলো না বুড়ো, রন্টির কাছে যাই।"

বুড়োদা বলল, "পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে। আমরা পুলিশ আসার জন্য অপেক্ষা করছি।"

আইডিয়া বলল, "আপনাদের পায়ে পড়ছি, আমাকে পুলিশে দেবেন না বাবু। তাহলে আমার ছেলে-বউ না খেয়ে মরবে।"

বুড়োদা বলল, "তবে বল্, ওই ফর্সা, দাড়িঅলা লোকটা কোথায় ?"

"এখানেই আছে বাবু। শনিবার ছেলেটাকে নিয়ে কলকাতায় যাবে !"

"শনিবার !" রণ্টির বাবা চমকে উঠলেন।

"শনিবার তো রণ্টিকে ফিরিয়ে দেবার দিন। এ রণ্টি না হয়েই যায় না। চলো না, রণ্টি যেখানে আছে সেখানে আমরা যাই।"

বুড়োদা বলল, "পুলিশ না আসা পর্যন্ত আমাদের এখানে অপেক্ষা করতেই হবে, যাওয়াটা ঠিক হবে না।"

রণ্টির মা বললেন, "রণ্টিকে নিয়ে যদি লোকটা পালিয়ে যায় ?"

বুড়োদা বলল, "লোকটা তো বলছে দাড়িঅলা ফর্সা লোকটা এখানেই আছে—ওই পোড়োবাড়িতে।"

আইডিয়া বলল, "হ্যাঁ বাবু, ও ওখানেই আছে, আমার জন্য অপেক্ষা করতেছে।"

চন্দোরকাকু হঠাৎ বলে উঠল, "তুমি মিথ্যে কথা বলছ না তো ?"

"মিথ্যে কথা বললে আমাকে যা ইচ্ছে তাই করবেন বাবু।"

বুড়োদা জিজ্ঞেস করল, "তুই কত টাকা পেতিস ওর কাছ থেকে ?"

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে আইডিয়া। তারপর মাথা চুলকোতে থাকে।

"কী হল, বল্ ?" ধমকে উঠল বুড়োদা।

"রোজ কুড়ি টাকা বাবু।"

"মাত্র কুড়ি টাকার জন্য তুমি এই জঘন্য কাজ করতে ?" চন্দোরকাকু বলে উঠল হঠাৎ।

"আমাকে পুলিশে দেবেন না বাবু।"

বুড়োদা বলল, "সত্যি কথা বললে তোর কিছুই হবে না।"

আইডিয়া বলল, "দাড়িঅলা ফর্সা লোকটাকে ধরতে গেলে আমাদের এক্ষুনি বের হতে হবে।"

চন্দোরকাকু বলল, "পুলিশ আসেনি যে এখনও। যদি হাতে পিস্তল-টিস্তল থাকে।"

বুড়োদা বলল, "সে রিস্ক্ আমাদের নিতে হবে। পুলিশের জন্য অপেক্ষা করলে হয়তো রণ্টিকে নিয়ে লোকটা অন্য কোথাও পালিয়ে যাবে।"

চন্দোরকাকু বলল, "বুড়ো, এ সব ভাল হচ্ছে না কিন্তু। আসতে দে না সামপানকে পুলিশ নিয়ে। কেন যে এত দেরি করছে সামপান !"

বুড়োদা বলল, "তুমি বুঝছ না কেন চন্দোরকাকু, পুলিশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে যদি পাখি উড়ে যায়।"

আমারও ইচ্ছে করছিল, এক্ষুনি ছুটে যাই ওই পোড়োবাড়িতে। ছেলেধরা ধরা পড়ুক আমাদেরই হাতে।

আইডিয়া বলল, "চলুন বাবু, এক্ষুনি ওই পোড়োবাড়িতে যাই।"

রণ্টির মা বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ভাল, রণ্টিকে কতদিন দেখি না।"

বুড়োদা বলল, "চল, আমরা ওই পোড়োবাড়িতেই যাই।"

চন্দোরকাকু বলল, "কী দরকার, সামপান এখুনি পুলিশ নিয়ে চলে আসবে।"

আমি বললাম, "না, আমরা এক্ষুনি যাব।"

বুড়োদা দ্রুত কী একটা ঢুকিয়ে নিল পকেটে। কী নিল বুড়োদা ?

রিভলবার-টিভলবার নাকি ?

মুন্নি আমার দিকে তাকাতে আমি ঠোঁট উল্টে কাঁধ ঝাঁকাই।

পুলিশের জন্য অপেক্ষা না করেই আমরা বেরিয়ে পড়ি। আমি, বুড়োদা, মুন্নি, রন্টির বাবা-মা আর আইডিয়া। আমাদের পিছন-পিছন রাগে গজগজ করতে করতে চন্দোরকাকু।

টুরিস্ট লজের পেছনের গেট দিয়ে আমরা প্রায় মিছিলের মতো সমুদ্রপারের দিকে এগিয়ে যাই। ঝাউবনের ভেতর দিয়ে আমাদের হন্তদন্ত হয়ে যেতে দেখে অন্য টুরিস্টরা অবাক হয়। তারা জানে না, বকখালিতে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই হুলুস্থুলু কাণ্ড ঘটে যাবে। মায় রক্তারক্তি কাণ্ডও ঘটে যেতে পারে। আধঘণ্টা গোলাগুলি বর্ষণের পর হয়তো ধরা পড়বে কুখ্যাত ছেলেধরার দল। রেডিয়ো থেকে টেপ রেকর্ডার নিয়ে লোক আসবে ছেলেধরা ধরার লোমহর্ষক বর্ণনা টেপ করতে। খবরের কাগজে ছবি বেরুবে প্রথম পাতায়।

৫

আমরা যখন সমুদ্রতীরে পৌঁছলাম তখন সেখানে লোক নেই। যতদূর দেখা যায়, শূন্য সমুদ্রতীর। প্রায় মাইল-দুই একেবারে ধুধু করছে। একটাও লোক নেই। এত নির্জন সমুদ্রপার প্রায় দেখা যায় না। আইডিয়া আমাদের আগে আগে গাইডের মতো যাচ্ছে। সামপানদা পুলিশ নিয়ে এখনও এসে পৌঁছয়নি। আমাদের একটু ভয়-ভয় করছিল। চন্দোরকাকুকে তো খুবই নার্ভাস দেখাচ্ছে। যাকে একটু দোষ পাচ্ছে, তাকেই বকে দিচ্ছে চন্দোরকাকু।

মাথার উপর নানা ধরনের বক উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। তারই মধ্যে একটা ঘোর লাল রঙের বক দেখতে পেলাম আমি। বুড়োদাকে বললাম, "বুড়োদা, ওই দ্যাখো, স্কারলেট আইবিস।"

বুড়োদা আমার কথায় কান দিল না কোনো। নিশিতে পাওয়া মানুষের মতো বুড়োদা হেঁটে যাচ্ছে সমুদ্রপার ধরে।

আমার ইচ্ছে করছিল, এক্ষুনি ছুটে গিয়ে ক্যামেরাটা নিয়ে এসে স্কারলেট আইবিসের গোটা কয়েক ফোটো তুলে ফেলি ঝটপট। অথচ বুড়োদা গা করছে না কোনো। যেন স্কারলেট আইবিসের ব্যাপারে ওর কোনো আগ্রহ নেই। এ ক'দিনের মধ্যে আজকেই স্কারলেট আইবিসের দেখা মিলতে মনটা যেন কেমন ভারী হয়ে উঠল হঠাৎ। অনেক দেশে ওই বককে অশুভের ইঙ্গিত বলে ভাবে। আজকে এখানে কোনো অশুভ ঘটনা ঘটবে না তো ? কী ভেবে বুকের ভেতরটা শিরশির করে উঠল।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্রপারের সেই পোড়োবাড়িটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। পোড়োবাড়িটার কাছে পৌঁছে গেছি প্রায়। হঠাৎ যেন মনে হল ঝাউবনের ভেতর থেকে একজন লোক ছুটে বেরিয়ে এল। বেরিয়েই সমুদ্রপার ধরে পুবদিকে দৌড়তে থাকে। লোকটাকে চেনা যাচ্ছে না। বুড়োদা পকেট থেকে ঝট করে দূরবিন বের করে লোকটাকে দেখতে থাকে। তারপর দূরবিন নামিয়ে চিৎকার করে বলল, "কাবুল, সেই ফর্সা, দাড়িঅলা, গগল্‌স-পরা লোক।"

রন্টির বাবা বললেন, "ফর্সা, দাড়িঅলা, গগল্‌স-পরা লোক ! দ্যাখো তো বুড়োদা, ওর জামাটা লাল কি না।"

বুড়োদা বলল, "হ্যাঁ, লাল জামাও

আছে। আপনারা ওই পোড়োবাড়িটার দিকে এগিয়ে যান। ওখানে আপনাদের ছেলেকে পেয়ে যাবেন। আমি দেখি লোকটাকে ধরতে পারি কি না।" তারপর মুন্নিকে বলল, "তুই আইডিয়া আর রণ্টির বাবা-মাকে নিয়ে ওই পোড়োবাড়িতে যা।"

চন্দোরকাকু বলল, "আমি কী করব রে বুড়ঢা?"

বুড়ঢাদা কোনো জবাব না দিয়ে আমাকে বলল, "চল্ কাবুল, লোকটাকে আমাদের ধরতেই হবে।"

চন্দোরকাকু রাগ-রাগ মুখ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আইডিয়ার পিছু-পিছু পোড়োবাড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

আমি আর বুড়ঢাদা ফর্সা, দাড়িঅলা লোকটাকে লক্ষ করে ছুটতে থাকি। লোকটা প্রাণপণে ছুটে যাচ্ছে সমুদ্রপার ধরে। আমি স্কুলের স্পোর্টসে দৌড়ে প্রাইজ পাই। অথচ লোকটার থেকে এখনও অনেক দূরে আমি। আমার পিছনে বুড়ঢাদা। মাঝে মাঝে দূরবিন তুলে লোকটাকে দেখে যাচ্ছে।

আমরা অনেক দূর চলে এসেছি। বাঁ দিকে ঝাউয়ের সারি মিলিয়ে গিয়ে জঙ্গল শুরু হয়ে গিয়েছে। বুড়ঢাদা দৌড়তে দৌড়তে বলল, "ওই যে লম্বা-লম্বা লালরঙের গাছগুলো দেখছিস, ওগুলো সুন্দরী গাছ। পাতাগুলো কী চকচকে দেখেছিস?"

আমরা ছুটতে ছুটতে লোকটার প্রায় কাছে এসে পড়েছি। বুড়ঢাদা দূরবিন দিয়ে দেখে বলল, "লোকটা আর দৌড়তে পারছে না রে কাবুল, ভীষণ হাঁপাচ্ছে। আমরা এক্ষুনি ওকে ধরে ফেলব।"

কেন পারবো না ?

এই কদিন আগে দোল চলে গেলো। তোমরা নিশ্চয়ই খুব রঙ খেললে। এই রঙ খেলার একটা ইতিহাস আছে জান তো? রাধাকৃষ্ণের দোল খেলার কথা তো জানাই আছে। কিন্তু ন্যাড়া পোড়া ও দোলের অন্য কারণটা আধুনিক মানুষের কাছে বেশী জরুরী। শীতকালের ঝরা পাতা, শুকনো ডালপালা, আবর্জনা সব জড়ো করে গ্রাম ও শহর পরিস্কার করা হোতো এককালে। তাতে আগুন দিয়ে মানুষ দোল উৎসবের আগের দিন রাত্রে আনন্দ করতো। আর বসন্তের আগমনে হাম ও বসন্তের প্রতিষেধক হিসেবে আবীর মাখা এও এক রকমের ওষুধেরই ব্যবহার। কারণ আবীর তৈরী করা হত আলু থেকে। যা মেখে স্নান করলে শরীর হয় স্নিগ্ধ ও শীতল। এ সময় যেমন কচি নিমপাতা ভাজা খাওয়াটা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী, ঠিক তেমন-ই এই আবীর খেলা। খেলাটাকে একটা ধর্মীয় আচরণে পরিণত করা হল তার গুরুত্ব বাড়াতে। তাহলেই বোঝ প্রত্যেক ঋতুর সঙ্গে প্রত্যেক উৎসবের কেমন যোগ ছিল। প্রয়োজনীয় পরিচ্ছন্নতাও পালন করা হল, আবার একঘেয়ে জীবনের মধ্যে উৎসবের আনন্দও হল। সঙ্গে সঙ্গে মনে প্রশ্ন জাগে যে এর থেকে আমাদের শেখার কি কিছুই নেই? আমরা কি ন্যাড়াপোড়ার দিনটাকে পাড়া পরিস্কার করার দিন বলে চিহ্নিত করতে পারি না? ঠিক যেমন রবিবার পড়ার টেবিল পরিস্কার, বইখাতার মলাট ঠিক করার দিন বলে ভাবতে পারি?

জন সংযোগ বিভাগ, সি এম ডি এ ৩এ অকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত

আমি বললাম, "বুড়োদা, ওর কাছে যদি ছুরি বা রিভলভার কিছু থাকে।"

বুড়োদা বলল, "ওর কাছে কিছুই নেই, তা হলে ও অ্যাটাক করত আমাদের।"

আমরা বকখালি থেকে অনেকদূর চলে এসেছি। কাছেপিঠে কোনো মানুষের চিহ্ন নেই। ঝাউবনের ওপাশে জঙ্গল। জঙ্গলের ভেতর থেকে লরির আওয়াজ ভেসে আসছে। কাঠ বয়ে আনছে লরিগুলো।

বুড়োদা বলল, "যে-কোনো মুহূর্তে হরিণ কিংবা বুনো শুয়োর বেরিয়ে আসতে পারে বনের ভেতর থেকে।"

আমি বললাম, "রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার।"

বুড়োদা বলল, "ও তো গভীর বনে থাকে, এখানে আসবে কী করে?"

কথা বলতে-বলতে আমরা ফর্সা দাড়িঅলা লোকটাকে প্রায় ধরে ফেলেছি। হঠাৎই বুড়োদা তিনবার হেঁচে উঠল। বুড়োদা হাঁচতেই আমি অবাক হই। এই জনমানবহীন সমুদ্রতীরে কী ঘটতে চলেছে, কে জানে! আমি থমকে যাই। সামনে তাকিয়ে দেখি, আমাদের থেকে খানিক আগে দাঁড়িয়ে লোকটা চিৎকার করছে।

আমি বললাম, "কী হল, লোকটাকে সাপে কামড়েছে নাকি?"

বুড়োদা বলল, "দূর বোকা, শীতকালে সাপ থাকে না!" তারপর দূরবিনটা আমার হাতে দিয়ে বলল, "দ্যাখো ভাল করে।"

দূরবিন দিয়ে তাকিয়ে দেখি, লোকটা বালির মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। তার কোমর পর্যন্ত ডুবে গেছে বালিতে।

বুড়োদা বলল, "সাবধান, এগোস না, চোরাবালি।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "সে কী!"

বুড়োদা বলল, "সমুদ্রের পারে অনেক সময় এরকম থাকে।"

আমি দূরবিনটা চোখে দিয়ে বললাম, "বুড়োদা, লোকটার দুটো হাত আকাশের দিকে। চোখে-মুখে আতঙ্ক। ওর ঠোঁট দুটো নড়ছে।"

আমি আর বুড়োদা সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে যাই। এগোতে-এগোতে বুড়োদা বলল, "যদি চোরাবালিতে ডুবে যাস, সঙ্গে সঙ্গে চিত হয়ে শুয়ে পড়বি।"

আমি বললাম, "ওকে বাঁচাবে না বুড়োদা?"

বুড়োদা বলল, "ওকে বাঁচাতে গেলে আমরাও ডুবে যাব। তা ছাড়া আমাদের কাছে দড়ি বা বাঁশ নেই। দড়ি বা বাঁশ দূর থেকে ছুঁড়ে দিয়ে এসব অবস্থায় বাঁচানো যায়।"

লোকটার বুক, গলা, মুখ সব শেষে মাথাটা ধীরে-ধীরে ডুবে গেল চোরাবালিতে। বালি আবার আগের মতো হয়ে গেছে। বোঝাই যাচ্ছে না, কয়েক মুহূর্ত আগে ওখানে একজন মানুষ ডুবে গেছে।

বুড়োদা পকেট থেকে মানিব্যাগ নিয়ে টাকা-পয়সা বের করে খালি মানিব্যাগটা সামনে ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে যায়।

বললাম, "আর এগিয়ো না বুড়োদা।"

বুড়োদা বলল,"দাঁড়া না, কোথা থেকে চোরাবালিটা শুরু হয়েছে দেখতে হবে না?"

আমার হঠাৎ স্কারলেট আইবিসের কথা মনে পড়ল। স্কারলেট আইবিস দেখলে অশুভ ঘটনা ঘটে, এরকম শোনা যায়।

আর কয়েক পা এগিয়ে মানিব্যাগটা ছুঁড়ে দিতেই সেটা ডুবে যায়

চোরাবালিতে। আর দেখা যায় না।

বুড়োদাদা বলল, "চল্ কাবুল, এবার ফেরা যাক।"

বুড়োদাদাকে খুব দুঃখী মনে হয়। ছেলেধরাকে সে শাস্তি দিতে চেয়েছিল। তাই বলে তার এভাবে মরে যাওয়াটা ভাল লাগেনি বুড়োদাদার। বুড়োদাদা ফিরে যাবার জন্য পেছন ফেরে। আমি উল্টোদিকে চেয়ে দেখি দূর থেকে কারা যেন ছুটে-ছুটে আসছে। কাছে আসতে দেখি মুন্নি, চন্দোরকাকু, আইডিয়া, রণ্টির বাবা-মা আর হারিয়ে-যাওয়া ছোট্ট ছেলে রণ্টি। ওরা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমি আর বুড়োদাদা ওদের দিকে।

ওরা কাছে আসতেই দেখি রণ্টির মা'র চোখে জল। রণ্টির মা বুড়োদাদাকে খুব আশীর্বাদ করলেন। রণ্টির বাবা বুড়োদাদাকে পুরস্কার দিতে চাইলেন।

বুড়োদাদা বলল, "আপনাকে কিছু দিতে হবে না। আপনি যদি আইডিয়াকে মানে ঈশ্বরদাস এরণ্ড আইচকে একটা চাকরি করে দেন, বড় উপকার হয় বেচারার।"

রণ্টির বাবা সঙ্গে-সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে আইডিয়াকে বললেন, "আমার সঙ্গে এই ঠিকানায় দেখা কোরো কলকাতায়।"

বুড়োদাদা ঈশ্বরদাসের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী আইডিয়া, আর এসব কাণ্ড করবে না তো?"

"না বাবু, শপথ করে বলছি, আর কখনও করব না।"

প্রায় সাষ্টাঙ্গে বুড়োদাদাকে প্রণাম করতে যায় আইডিয়া।

বুড়োদাদা তাড়াতাড়ি ওকে হাত ধরে তুলে নেয়। তারপর রণ্টির দিকে তাকিয়ে বলল, "কী রণ্টিবাবু, মা-বাবাকে পেয়ে ভাল লাগছে না?"

রণ্টি কথা বলে না কোনো। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

এমন সময় চন্দোরকাকু জিজ্ঞেস করল, "সেই ফর্সা, দাড়িঅলা লোকটা কোথায় গেল?"

বুড়োদাদা আমার দিকে একপলক তাকিয়ে বলল, "ধরতে পারলাম না ওকে, পালিয়ে গেল।"

মুন্নি বলল, "সে কী!"

বুড়োদাদা আছে, অথচ ছেলেধরা ধরা পড়ল না, এটা যেন বিশ্বাস করতে পারছে না মুন্নি।

চন্দোরকাকু বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, মুরোদ বোঝা গেছে! ও সব প্রাইভেট টিকটিকিগিরি সব জায়গায় খাটে না।"

রণ্টির বাবা বললেন, "লোকটাকে ধরে পুলিশের হাতে দেওয়া গেল না, বড় আপসোস রয়ে গেল।"

বুড়োদাদা কোনো কথা বলল না আর। আমি বুঝতে পারলাম না, কেন বুড়োদাদা চোরাবালির কথাটা কাউকে জানাল না।

এমন সময় পুলিশের হুইস্‌ল শোনা গেল। সামপানদা পুলিশ ফোর্স নিয়ে ছুটে আসছে।

বুড়োদাদা বলল, "পোলিশ অ্যাপিয়ার্স হোয়েন এভরিথিং ইজ ওভার।"

সমুদের ঢেউ আসছে আর যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে সমুদ্রের একটানা গর্জন।

বুড়োদাদা একপাশে সরে দাঁড়ায়।

আকাশে উড়ে যাচ্ছে একটা ঘোর লাল রঙের বক। একা-একা।

আকাশের দিকে দূরবিন তাক করে বুড়োদাদা আস্তে বলল, "স্কারলেট আইবিস।"

আমি ছাড়া সে-কথা কেউ শুনতে পেল না।

ছবি : দেবাশিস দেব

জানুয়ারির মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়েছিল, চলল টানা মার্চ মাসের অর্ধেক পর্যন্ত। একটুও যেন বিশ্রাম নেই। ছোট্‌কা যে কত জায়গা থেকে বিয়ের নিমন্ত্রণ পায়, তার আর হিসেব নেই।

শুধু কি বিয়ের! পৈতে, জন্মদিন, মুখে-ভাত—এমনও কম হয় না।

ছোট্‌কার একটা ব্যাপার দেখেছি, নিমন্ত্রণের কার্ডগুলো চট করে ফেলে দেয় না। মাসকয়েক ধরে জমা হতে থাকে, তারপর একদিন ওগুলো নিয়ে বসে। বেছে-বেছে দু-একটা রাখে, দু-একটা থেকে কাঁচি দিয়ে কেটে-কেটে উপহার-লেখার কার্ড তৈরি করে। নানা মাপের, নানা আকারের সুন্দর-সুন্দর কার্ড।

সেদিন বুঝি এমনই একটা দিন ছিল। আমি ধাঁধা চাইতে গেছি, ছোট্‌কা বলল, 'আধ ঘণ্টা ঘুরে আয়।'

আধঘণ্টা পার করে যখন গেলাম, দেখি ধাঁধা তৈরি। এই মাঘ-ফাল্গুনেরই তিনটে বিয়ে নিয়ে ধাঁধা। কী ভাবে বুঝলাম? আসলে, তিনজনের নামই আমার চেনা। ছোট্‌কার কাছেই দেখেছি। যাক্‌, ধাঁধাটা বলি।

প্রথম ধাঁধা ॥ তিন বন্ধু। জ্যোতির্ময়, বিদ্যুৎ ও দীপক। তিনজনই খেলাধুলার ভক্ত। এদের বিয়ে হয়েছে অতি সম্প্রতি। তিনজনের স্ত্রীর নাম কল্পনা, শাশ্বতী, মাধবী। অবশ্য যথাক্রমে বলা হয়নি। এলোমেলোভাবে বলা।

স্কুলে-কলেজে জ্যোতির্ময় ছিল নামকরা ফুটবল-খেলোয়াড়। বিদ্যুৎ দু-দুবার কলেজের ক্যারাম-চ্যাম্পিয়ন। দীপক নামী সাঁতারু। এখানেই বলা ভাল, দীপকের স্ত্রী জল দেখলেই ভয় পায়। সাঁতার শেখা তো দূরের কথা।

কল্পনা খুব ভাল ব্যাডমিন্টন খেলে, বাস্কেটবলও খেলেছে একসময়। শাশ্বতীর একটা পরিচয়—সে হল দীপকের বোন, অন্য পরিচয়—সে খুব ভাল নাচে। 'শ্যামা'য় শ্যামার, 'চণ্ডালিকা'য় প্রকৃতির ভূমিকা কলেজ-জীবনে বাঁধা ছিল শাশ্বতীর।

মাধবী নিজে ভাল সাঁতারু, তার স্বামীর কোনোকালেই ঘরে-বসে খেলাধুলায় একদম আগ্রহ নেই।

এই সব তথ্য থেকে বলতে হবে, কে কার স্বামী।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—

সুনিঅন্দরন্দ্য

তৃতীয় ধাঁধা ॥ ভুবনে আছে, পৃথিবীতে আছে অথচ চরাচরে নেই—কী সেই বস্তু?

গতবারের উত্তর ॥ (১) কমলের ধারণা অনুযায়ী সে তার ঘড়ির ৮-২০ মিনিটে স্টেশনে পৌঁছবে, আসলে তখন ৮-৩০। ট্রেন ছেড়ে গেছে। অমল স্টেশনে পৌঁছবে তার ঘড়ির ৭-৪৫-এ। আসল সময় তখন ৭-৫০। ট্রেন পাবে। (২) আজানুলম্বিত। (৩) চাঁপা। বইটা হল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাঁদের পাহাড়'।

সত্যসন্ধ

এই সুরক্ষা ভরা ধোলাই
সানলাইটের কোমলতা থেকে পাই

বিশুদ্ধ সানলাইট আপনার জামাকাপড় ধোয় কত কোমলভাবে···আর আপনার হাতেরও কোনো ক্ষতি করে না। সানলাইট দিয়ে আপনার কাপড় হয়—গর্ব করার মত ঝলমলে রঙীন আর ধবধবে সাদা।

কাপড়ের যত্নে ধন্য,
সানলাইট... অনন্য!

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

LINTAS SUN 8-159 BG

শব্দ-সন্ধান

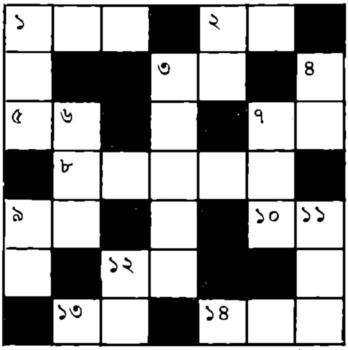

সংকেত : পাশাপাশি : (১) হাওয়াই খেলনা। (২) কামান। (৩) ফলবিশেষ। (৫) সাধ। (৭) গাছ। (৮) এক ফুল এক ফল, দুয়ে মিলে কোন্ ফল? (৯) শূন্যস্থান পূরণ করো : বিতর্কিত — নিয়ে খেলার মাঠে — বাধল। (১০) খই। (১২) বন। (১৩) ধাতুবিশেষ। (১৪) কোন্ পাখি একটা দেখা ভাল নয়?

উপর-নীচ : (১) জ্ঞানশূন্য। (২) টিয়াপাখি। (৩) পূজার ঘটে লাগে। (৪) বান্ধবী। (৬) নভোমণ্ডল। (৭) পাগড়িবিশেষ। (৯) রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত উপন্যাস। (১১) শেয়াল। (১২) শাজাহান-পুত্র।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

মি	শু	ক		শা	ল্ম	ল
সি		র	সা	ল		বে
সি		ত	ড়া	গ		জা
পি	ছ	ল		ম	শা	ন
	ম		হা		ন্ত	
মা	ছ		ও		ন	বী
	ম	য়	দা	ন	ব	

মজার খেলা

এবারের মজার খেলার জন্য শুধু কাগজ-পেন্সিলই যথেষ্ট। আর কিচ্ছু চাই না। ওহো, ভুল হল। চাই বইকি। চাই বন্ধু। যাকে দেখাবে এই খেলা। দেখিয়ে জব্দ করবে।

নীচের ছবিটার মতো একটা ছবি এঁকে ফেলো কাগজে। অক্ষরগুলোও যেমন-যেমন রয়েছে, তেমনি বসাও।

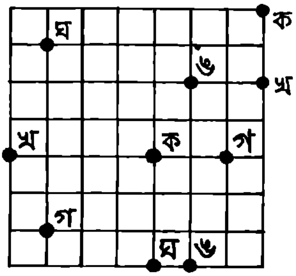

এঁকেছ? ব্যস। এবার কোনো বন্ধুর সামনে এই ছবিটা রাখো। সে কী করবে, দুটো 'ক', দুটো 'খ', দুটো 'গ', দুটো 'ঘ' আর দুটো 'ঙ'-কে এমনভাবে দাগ টেনে টেনে যোগ করবে, যাতে কখনো একটার ওপর দিয়ে আরেকটা দাগ যাবে না, একটা দাগ আরেকটা দাগের সঙ্গে কখনো মিশবে না, এমনকি স্পর্শ পর্যন্ত করবে না।

বন্ধু করুক। তুমিও করো। আর, নিজে করে না পারলে যাতে বন্ধুকে করে দেখানো যায়, সেজন্য একটা সমাধান দেওয়া হল। নিজে না পারলেই এটা দেখবে। আগে নয়।

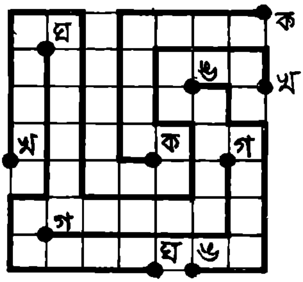

মজারু

কিসের ফোটো

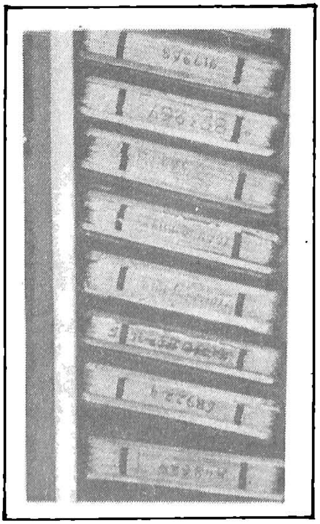

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল ঘোড়ার খুরের ফোটো

ফোটো : তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ মাথার চুল খাড়া করা ভূতের গল্প শুনিয়ে কাকে জব্দ করা যায় না ?

উঃ টাকমাথা লোককে।

প্রঃ মাছের ঝোল দিলে, এতে মরা মাছি ভাসছে দেখতে পাচ্ছ ?

উঃ গরম মাছের ঝোল চাইলেন তো, মাছি পড়লে মরবেই।

প্রঃ গোবর-সারে কি ভাল ফসল হয় ?

উঃ সম্ভবত হয়, ক্লাসে লম্বা চুলওয়ালা ছেলেগুলোকে মাস্টারমশাই প্রায়ই বলেন, মাথায় গোবর।

সুসেন

হাসিখুশি

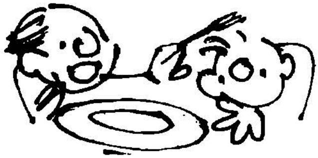

"এই হোটেলের পিছনে একটা বিরাট ইতিহাস আছে। আপনারা কি কিছু ঘটনা শুনবেন ?"

"তা শুনতে পারি। কিন্তু তার আগে কি একশো বছর আগেকার তৈরি এই কাটলেট সম্পর্কে কিছু বলবেন ?"

●

"আপনার আর আপনার বাবার মধ্যে কখনও মতের অমিল হয়নি ?"

"হয়েছেই তো। কিন্তু বাবাকে এ সম্পর্কে কিছু জানাইনি।"

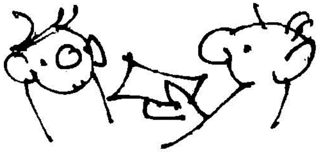

"তুমি যদি আমার সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করো, তোমাকে একশো টাকা দেব।"

"তাই নাকি! কোথায় সেই একশো টাকা ?"

"না, তোমার চিন্তাটা দেখছি অন্যরকম।"

"তোমার মাথার একটা এক্স-রে করতে হবে।"

"একটু দাঁড়ান, চুলগুলো ঠিক করে নিই।"

ছবি : অহিভূষণ মালিক

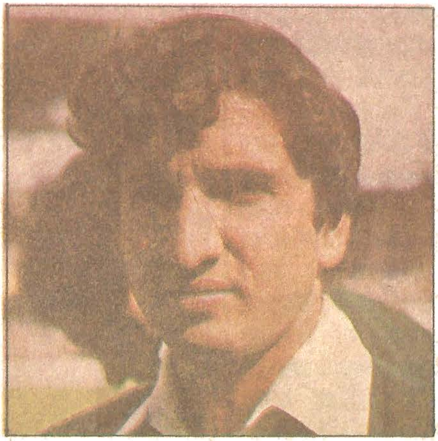

আবদুল (ইংল্যাণ্ড যাঁর বলে বিভ্রান্ত হয়েছিল)

পাকিস্তানে ইংল্যাণ্ডের প্রথম পরাজয়

সুব্রত সিংহ

স্বদেশের মাটিতে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট জয়ের স্বাদ পেল পাকিস্তান ; করাচি ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে চলতি টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্টে তিন উইকেটে জয়ের সুবাদে। তিন টেস্টের সিরিজে পাকিস্তান আপাতত ১-০ ম্যাচে এগিয়ে রইল। এই সিরিজ শুরু হওয়ার আগেই পাকিস্তান ও ইংল্যাণ্ড দুই দলই যথাক্রমে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ হেরে মনোবলের দিক দিয়ে অনেকটা পিছিয়ে ছিল। এই টেস্ট জিতে পাকিস্তান দলের মনোবল নিঃসন্দেহে অনেক বেড়ে গেল।

স্বল্প রানের এই টেস্টটি এতই নাটকীয় মোড় নিয়েছিল যে, সেদিনকার উপস্থিত দর্শকরা খেলার প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেছেন এবং খেলার শেষ বলটি না হওয়া পর্যন্ত কেউ বলতে পারেননি, খেলার ফলাফল কী হতে চলেছে। শেষপর্যন্ত অবশ্য ভাগ্যদেবতা পাকিস্তানের প্রতিই প্রসন্ন হন।

এই টেস্টটিকে অনায়াসে স্পিনারদের টেস্ট হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। বর্তমানে যখন পেস্ বোলাররা বিশেষভাবে আধিপত্য বিস্তার করে চলেছেন, টেস্ট জয়ে মূলত তাঁরাই মুখ্য ভূমিকা নিচ্ছেন, ঠিক সেই সময়ে স্পিনারদের এই আধিপত্য নিঃসন্দেহে যথেষ্ট প্রশংসা দাবি করতে পারে। এই টেস্টে দু'দেশের দু'ইনিংসে যে মোট ৩৭টি উইকেটের পতন ঘটেছিল, তার মধ্যে ২৬টিই জমা পড়েছিল স্পিনারদের ঝুলিতে। তবে দু'দেশেরই স্বল্প রানে ইনিংস শেষ করে

দেওয়ার পিছনে সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন দু'দেশের দুই স্পিনার আবদুল কাদির ও নিক কুক্।

একদিকে যেমন পাকিস্তানের জয়ে কাদির মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমনই পাকিস্তানের জয়ের স্বপ্ন প্রায় ভেঙে দিতে বসেছিলেন ইংল্যাণ্ডের বাঁ-হাতি স্পিনার নিক্ কুক্। দু'ইনিংসে তাঁর সংগ্রহ ১১টি উইকেট, মাত্র ৮৩ রানের বিনিময়ে। মাত্র ৬৪ রান করলেই জিতবে, এমন অবস্থায় খেলতে নেমে পাকিস্তানি ব্যাটস্ম্যানেরা একের পর এক উইকেট বিসর্জন দিতে থাকেন ওই কুকের বাঁ-হাতি স্পিনে বিভ্রান্ত হয়ে। এত করেও কুক অবশ্য দেশকে জেতাতে পারেননি।

অপরদিকে পাকিস্তানের এই স্মরণীয় জয়ে কাদির যে ভূমিকা নিয়েছিলেন, তা পাকিস্তানের ক্রিকেট-অনুরাগীরা সহজে ভুলে যাবেন না। তিনি যে শুধু ইংল্যাণ্ডের দু'ইনিংসে ৮টি উইকেট দখল করেই পাকিস্তানের জয়ের পথ সুগম করে দিয়েছিলেন তা নয়, উপরন্তু ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের রানকে অতিক্রম করতে তাঁর ৪০টি রান যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

এই টেস্টটি পাকিস্তানের একুশ বছর বয়সী টেস্টে নবাগত উইকেটকিপার অনিল দলপতের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর ১৬ রান (সর্বাধিক) যে শুধু স্বদেশের মাটিতে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট-জয় এনে দিতে সাহায্য করেছিল তা নয়, তিনি প্রথম হিন্দু ক্রিকেটার যিনি পাকিস্তানের হয়ে টেস্ট খেলার সুযোগ পেলেন। অনিল দলপত সম্পর্কে আলাদা একটি লেখাও এই সংখ্যায় ছাপা হল। তোমরা পড়ে নিও।

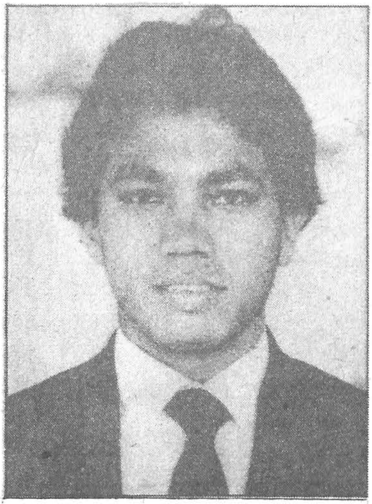

ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

পাকিস্তানের অনিল

মণি শর্মা

টেস্ট ক্রিকেটে অখণ্ড ভারতের অভিষেক হয়েছিল উনিশশো বত্রিশ সালে। অর্থাৎ আজ থেকে বাহান্ন বছর আগে। আর পাকিস্তান টেস্ট খেলতে শুরু করেছে '৫২-৫৩ সাল থেকে। আবদুল হাফিজ কারদারের নেতৃত্বে পাকিস্তান ভারত-সফরে এসে দিল্লির ফিরোজ শা কোটলা মাঠে প্রথম টেস্ট ক্রিকেটের স্বাদ পায়। সেবার টুকটুকে ফর্সা আর মিষ্টি চেহারার এক তরুণকে উইকেটরক্ষা করতে দেখা গিয়েছিল, যিনি পরবর্তীকালে ব্যাটসম্যান হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। বললে অনেকে হয়তো বিশ্বাসই করতে চাইবে না, টেস্টে পাকিস্তানের প্রথম উইকেটকিপারের নাম হানিফ মহম্মদ। সফরে তিনটি টেস্টে

তিনি উইকেটকিপারের দায়িত্ব পালন করেন ; পরে তাঁর জায়গায় আসেন ইমতিয়াজ আমেদ।

সেই থেকে আজ অবধি পাকিস্তান দলে যাঁরা খেলেছেন, তাঁদের মধ্যে একজনও হিন্দু নেই। এ বছর মার্চ মাসে পাকিস্তানের নির্বাচক সমিতি অনিল দলপতকে জাতীয় দলের সদস্য হিসেবে মনোনীত করার ফলে এই প্রথম একজন হিন্দু পাক ক্রিকেট দলে অন্তর্ভুক্ত হলেন। ওয়াসিম বারির অবসর নেওয়ার পর থেকে পাকিস্তান একজন প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তরুণের সন্ধান করছিল। হাসিব আহ্‌সানের মতে, অনিলের মধ্যে অনেক সম্ভাবনা আছে।

একুশ বছর বয়সী এই উইকেটরক্ষক, বহুদিন যাবৎই পাক ক্রিকেট-বিশেষজ্ঞদের নজরে পড়েছেন। কিন্তু সরাসরি জাতীয় দলে চলে আসার প্রশ্ন ছিল না। কারণ, ওয়াসিম বারির মতো উইকেটরক্ষক তখন পূর্ণ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। হঠাৎ বারি অবসর গ্রহণের কথা ঘোষণা করায় নির্বাচকদের উদ্যোগী হতে হয় নতুন কাউকে খুঁজে নেওয়ায়। সফরকারী ইংল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলবার দরজা খুলে যায় অনিল দলপতের সামনে। অনিল দলপত '৮১-৮২ মরসুমে অস্ট্রেলিয়া সফরে যেতে পারেননি। তবে ব্যাংককে আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় তিনি চমৎকার খেলেছিলেন। মূলত তাঁরই প্রচেষ্টায় পাকিস্তান একাদশ ট্রফি জিতেছিল। পাকিস্তানে ফিরে দলপত সংখ্যালঘুদের জন্য নির্দিষ্ট সাড়ে বারো হাজার টাকার সাংস্কৃতিক পুরস্কার পান। পি· আই· এর কর্মী অনিল প্রথম টেস্টেই দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর দৃঢ়তার ফলেই পাকিস্তান জিততে পেরেছে।

ক্যাচ ধরার রেকর্ড

অশোক রায়

যদিও ব্যাপারটি ব্যাটিং সংক্রান্ত নয়, তবু এই লেখার গোড়াতেই এসে যাচ্ছে গ্রেগ চ্যাপেলের নাম। শুরুর মতোই জীবনের শেষ টেস্টেও গ্রেগের ব্যাটে সেঞ্চুরির ফ্ল্যাগ উড়েছে, এটা আমরা জেনেছি। কিন্তু অনেকেই হয়তো এটা জানো না জীবনের শেষ টেস্টেই গ্রেগ একটি অসাধারণ বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন, ক্যাচ ধরায়। গ্রেগ চ্যাপেল উইকেটরক্ষক নন। তাই হাতে বিশাল দস্তানা পরার কোনো সুযোগই তাঁর নেই। তবু সতর্ক একাগ্রতা, অ্যাক্রোব্যাটিক ফিট্‌নেস্ এবং দুটি খালি হাত কাজে লাগিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে ১২২টি ক্যাচ ধরে অনবদ্য বিশ্বরেকর্ড গড়লেন গ্রেগ। পাকিস্তানের বিপক্ষে সিডনিতে পাক-ওপেনার মহসিন খানের অসতর্ক ব্যাট জিওফ লসনের বহির্মুখী বলে লোভী ঠোক্কর দিতেই সেটি একশো একুশ নম্বর হিসেবে চ্যাপেলের তালুবন্দী হয়। তারপরে সেলিম মালিককে মুঠোয় তুলে গ্রেগ পৌঁছন একশো বাইশে।

ক্যাচ ধরায় গ্রেগের আরও দুটি বিশ্বরেকর্ড আছে। ১৯৭৪-৭৫ সিরিজে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে পার্থে গ্রেগ মোট সাতটি ক্যাচ ধরে একটি বিশ্বরেকর্ড গড়েছিলেন। অবশ্য ১৯৭৬-৭৭ সিরিজে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে বাঙ্গালোরে ভারতের যজুবেন্দ্র সিংও সাতটি ক্যাচ ধরে গ্রেগের বিশ্বরেকর্ডকে ঝাঁকুনি দিয়েছিলেন। গ্রেগই পৃথিবীর একমাত্র ফিল্ডসম্যান যিনি একটি নির্দিষ্ট দেশের বিপক্ষেই (ইংল্যাণ্ড)

যদি আপনি অন্য সাবানেরও ভেতর-বাইরে দেখতে পেতেন!

পিয়ার্স সাবানের বিশুদ্ধ রত্নের মত স্বচ্ছতাই দেখিয়ে দেয়, আপনার কেনা অন্য কোনো সাবানের চেয়ে এটি কত ভিন্ন ধরণের।

পিয়ার্স—এক অতি বিশুদ্ধ সাবান, এতে এমন কোনো মিশ্রণের সংযোজন করা হয় না যা আপনার মোলায়েম ত্বকে কোনোরকম ক্ষতি পৌঁছতে পারে।

পিয়ার্স সাবানে কোনো কর্কশ ধরণের উপাদান থাকে না। ত্বকে অস্বস্তি আনতে পারে এমন কোনো সুগন্ধ বা রঞ্জক, বা ফেনা তৈরী করার কোনো কৃত্রিম উপাদান মেশানো হয় না।

তাই আপনি আপনার ত্বকে অনুভব করেন এক ঝরঝরে পরিষ্কার আর তরতাজা ভাব, অথচ কোনোরকম শুকনো "টানটান" ভাব থাকে না।

সেজন্যেই তো, এত বছর পরেও, আজও আমরা পিয়ার্স সাবান তৈরী করি সেই একই পদ্ধতিতে।

আজও এটি তৈরী করতে আমরা ব্যবহার করি, স্বাভাবিক তেল, আসল গ্লিসারিন আর সেই একই মৃদু কোমল সুগন্ধ।

আজও আমরা প্রতিটি সাবান, পরিপক্ক ক'রে তোলার জন্যে দশ সপ্তাহ ধরে রেখে দিই, যাতে বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে প্রয়োজনীয় সুষমতা আসে।

আর তাই, আমাদের এত যত্নের ফলে আজও আপনি এর চেয়ে বেশী বিশুদ্ধ অন্য কোনো সাবান কিনতেই পারেন না!

অন্য সাবান হয়তো এর চেয়ে সস্তা হতে পারে, কিন্তু আপনার কোমল ত্বকের জন্যে তো একমাত্র পিয়ার্স-এর কোমলতারই প্রয়োজন, তাই না?

পিয়ার্স সময়ের ছায়া পড়তে না দিয়ে আপনার ত্বকের গ্লানিহীন তারুণ্য বজায় রাখে।

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

LINTAS PS 61 1913 BG

গ্রেগ চ্যাপেল (ক্যাচ-মাস্টার)

পঞ্চাশের বেশি ক্যাচ (৬১টি) ধরার দুর্ধর্ষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

এবার গ্রেগের পাশাপাশি অন্যান্য দেশের সেরা ক্যাচওয়ালাদের একটু দেখা যাক। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে সর্বাধিক ক্যাচ ধরার কৃতিত্ব রয়েছে কলিন কাউড্রের (১২০টি) দখলে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ১০৯টি ক্যাচের রেকর্ড ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠ অলরাউণ্ডার গ্যারি সোবার্সের ঝুলিতে। দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে সব থেকে বেশি ক্যাচ জমা রয়েছে ব্রুস মিচেলের (৫৬টি) জিম্মায়। ভারত-পাকিস্তানের পক্ষে দুটি কৃতিত্ব সুনীল গাওস্কর (৮৫টি) এবং মজিদ খানের (৬৫টি)। বিভান কংডনের ধরা ৪৪টি ক্যাচের রেকর্ডটিই নিউজিল্যাণ্ডের সব-সেরা সংগ্রহ।

গ্রেগ চ্যাপেল ছাড়াও ক্যাচ ধরায় সেঞ্চুরির কৃতিত্ব কিন্তু আরও তিনজনের রয়েছে। এঁরা হলেন অস্ট্রেলিয়ার ববি সিম্পসন (১১০টি), ইয়ান চ্যাপেল (১০৫টি) এবং ইংল্যাণ্ডের ওয়ালি হ্যামণ্ড (১১০টি)।

প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ক্যাচ ধরার সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তটি রয়েছে ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত অলরাউণ্ডার ফ্রাঙ্ক উলির দখলদারিতে (১০১৫টি)।

‘গালি’তে কে ?’

সম্রাট রায়

জানি, আগে কখনও খেয়ালই করোনি। এবং এও জানি, এবার থেকে কোনো টিম মাঠে ফিল্ডিং করতে নামলেই তোমাদের সতর্ক-চোখ খুঁজে বেড়াবে টিমের অফ্‌স্পিনারটিকে। আর যদি তার সন্ধান মেলে, তবে নির্ঘাত তোমাদের গোয়েন্দা-চক্ষু তাকে ফলো করে দেখবে গুটিগুটি পায়ে সে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

ব্যাপারটা একটু খুলেই বলা যাক। ল্যান্স গিব্‌সকে মনে আছে? ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ল্যান্স গিব্‌স ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত অফ্‌স্পিনার। ডেনিস লিলির আগে এই গিবসই ছিলেন টেস্টে সর্বোচ্চ উইকেট-শিকারি। সেই বিখ্যাত অফ্‌স্পিনারটি মাঠে নেমে কোথায় গিয়ে

বেঙ্কটরাঘবন (গালিতে ফিল্ডিং)

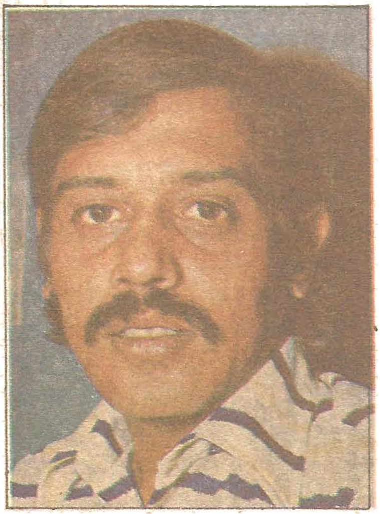

দাঁড়াতেন জানো ? সোজা চলে যেতেন 'গালিতে'।

এইখানে একটা প্রশ্ন ছিট্‌কে উঠতে পারে—'এ আর এমন কী খবর ! কেউ না কেউ তো গালিতে দাঁড়াবেনই !'

ঠিক কথা। কিন্তু এটা কি জানো, অধিকাংশ অফস্পিনারের পছন্দসই জায়গাটি 'গালি' ? তোমাদের হাঁ-করা মুখ আর বিস্ময়ে গোলগোল চোখের সামনেই কয়েকটি নমুনা সাজিয়ে দেওয়া যাক।

গিবসের পরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজেরই আরেক অফস্পিনার ডেরেক প্যারি দাঁড়াতেন গালিতে। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে অফস্পিনার ম্যালেটের জায়গা ছিল গালিতে। তারপরে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বহু অবিশ্বাস্য ক্যাচ ধরেছেন আরেক অফস্পিনার ব্রুস ইয়ার্ডলে! ইংল্যাণ্ডের বিশ্ববিখ্যাত অফস্পিনার জিম লেকারের (একটি টেস্টে উনিশটি উইকেট পাবার বিশ্বরেকর্ড আছে) প্রিয় ফিল্ডিং পজিশন ছিল গালি। তারপরে সেই জায়গাটি পালাক্রমে পাহারা দিয়েছেন ফ্রেড টিট্‌মাস, ডেভিড অ্যালেন, রে ইলিংওয়ার্থ ও জন এমবুরি। দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে সব-সেরা অফস্পিনার হিউ টেফিল্ডের মন-পসন্দ্ জায়গাটি গালি। শ্রীলঙ্কার অফস্পিনার ললিত কালুপেরুমাও ছিলেন গালিতে যথেষ্ট দক্ষ। আর আমাদের ভারতের অফস্পিনার বেঙ্কট রাঘবনও গালি থেকে তালুবন্দী করেছেন বেশ কিছু অবিশ্বাস্য ক্যাচ।

এখন একথা নিশ্চিত, এই লেখা পড়ার পরে ক্রিকেট-মাঠে গেলেই তোমাদের নজর থাকবে 'গালি'তে। ওই বিশেষ জায়গায় দাঁড়ানো ফিল্ডম্যানটিকে দেখলেই প্রশ্ন উঁকি দেবে মনে—'গালিতে কে ?'

এশীয় ক্রিকেট কাপ

মণীশ মৌলিক

পায়ে অপারেশন করাবার কথা ছিল অনেকদিন আগেই। কিন্তু কপিলদেব বোস্টনে অপারেশন করাতে গেলেন কিছুদিন আগে। সফল অস্ত্রোপচারের পর দেশে যখন কপিল ফিরে এলেন তখন এশীয় কাপ ক্রিকেটের জন্য দল ও অধিনায়ক নির্বাচন শুরু হওয়ার মুখে। নির্বাচনের প্রথম দিনে অধিনায়ক ঠিক করার ব্যাপারে নির্বাচকরা কেউ একমত হতে পারেননি। বোম্বাইতে প্রথম দিনে সভা শেষ হওয়ার পর সভাপতি গোলাম আমেদের কথাবার্তা থেকে আঁচ করা যাচ্ছিল, দু-একজন নির্বাচক কপিলকে অধিনায়ক হিসেবে চাইছেন না। তাঁরা চান, অন্য কেউ নেতৃত্ব দিন। দলনায়ক হিসেবে সুনীল গাওস্করের নাম উঠতে ফের নির্বাচকদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। আলোচনার মাধ্যমে কোনো সিদ্ধান্তে না আসতে পারার ফলে পরদিন আবার অধিনায়ক নির্বাচনের সভা বসে। দ্বিতীয় দিনে সর্বসম্মতিক্রমে গাওস্করকে দলনেতা হিসেবে নির্বাচন করা হয়।

মজা অন্য জায়গায়। কপিল বলেছেন, তিনি আগেই বোর্ডের কর্মকর্তাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, এশীয় ক্রিকেট কাপে তাঁর পক্ষে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হবে না। বোস্টনে অস্ত্রোপচার করার পর ডাক্তাররা তাঁকে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে পুরো এপ্রিল মাসটা বিশ্রাম নেবার পরামর্শ দিয়েছেন। কপিলদেব মাঠে নামতে পারবেন না, এমন নয়। তবে পরে আর কোনো অসুবিধে যাতে না হয়

সেজন্য চিকিৎসকরা তাঁকে বিশ্রাম নিতে বলেছেন। নির্দিষ্ট সময়ের পর চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য তিনি আবার বিদেশ যাবেন। তার আগে খেলার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

তাহলে নির্বাচকদের সভায় কপিলকে নিয়ে কথা উঠল কী করে? সরদেশাই কপিলের বিরুদ্ধে যে-সব মন্তব্য করেছিলেন সে-সব নিয়ে আলোচনাই বা হল কেন? হয় কপিলদেবের পাঠানো খবর কর্তাদের কাছে পৌঁছয়নি অথবা তাঁর বিশ্রাম নেবার সিদ্ধান্তকে বোর্ড পাত্তা দিতে চায়নি। অবাক ব্যাপার।

যাই হোক, গাওস্কর ফের ক্যাপ্টেন হলেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অধিনায়ক হিসেবে গাওস্কর বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করতে পারেননি। পৃথিবীর বড়-বড় ক্রিকেট-সমালোচকরা তাঁকে রক্ষণাত্মক দলনায়ক বলেছেন। অবশ্য এর বিরুদ্ধে কিছু-কিছু যুক্তি খাড়া করা যায়। সে কথা যাক। আমরা এখন অনেক আগ্রহ নিয়ে সারজায় এশীয় কাপের খেলার দিকে তাকিয়ে থাকব।

৬ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে কাপের খেলা। পাকিস্তান, ভারত ও শ্রীলঙ্কা এতে অংশ নেবে। খেলা হবে লিগ প্রথায়। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারত ও পাকিস্তান দুটি বড় নাম। এই দুই দেশের দলগত শক্তি শ্রীলঙ্কার তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু ক্রিকেটের কথা কেউই নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না। গত বিশ্বকাপই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। স্যার গ্যারি সোবার্সের প্রশিক্ষণে শ্রীলঙ্কা দলের শক্তিও একেবারেই ফেলনা নয়। তবু আসল লড়াইটা যে জমবে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

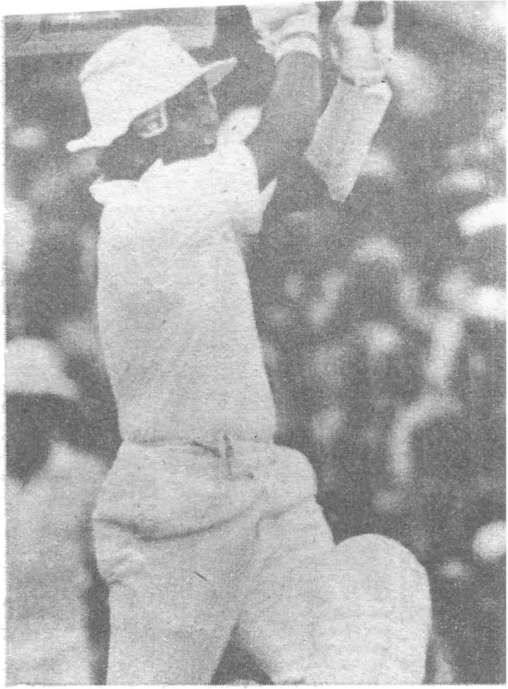

সুনিল গাওস্কর (আবার নেতার আসনে)

কপিলদেব (কথা উঠল কেন?)

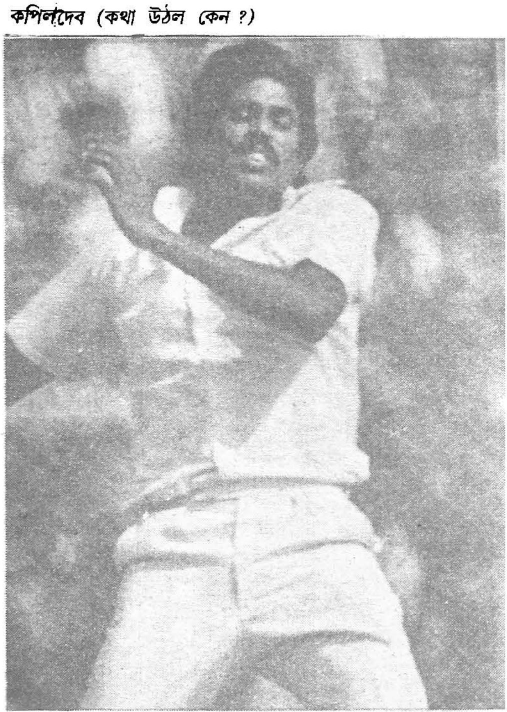

ফ্ল্যাশ গর্ডন

ওরা আমার পিছু নিয়েছে ভালটান্!
পক্ষী-মানবরা, তৈরি থাকো!
অজস্র পক্ষী-মানব !
হুঁশিয়ার !
কিন্তু ফ্ল্যাশ ও পক্ষী-মানবরা ততক্ষণে মিংয়ের রকেটের উপরে হামলা চালিয়েছে !
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

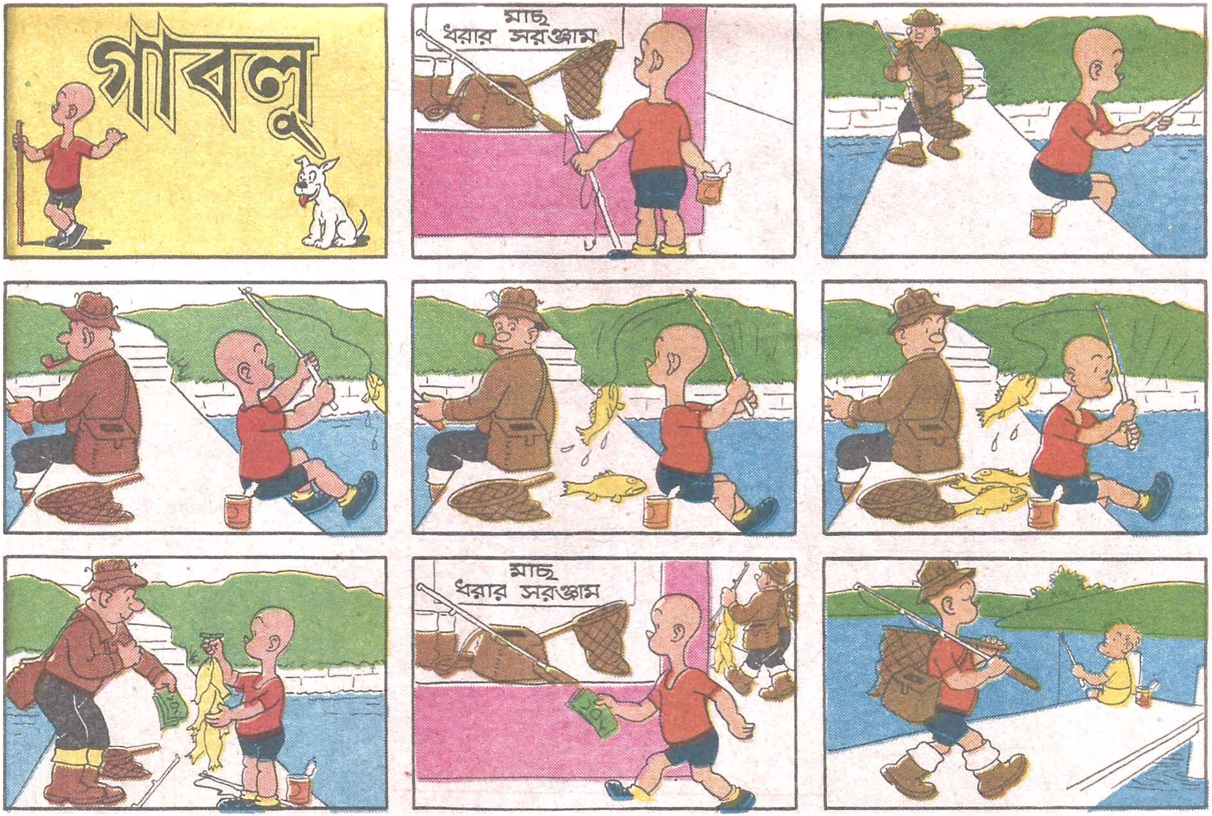
গাবলু
মাছ ধরার সরঞ্জাম
মাছ ধরার সরঞ্জাম

যুক্তব্যঞ্জনের গণ্ডগোল

বাচস্পতি

পরদিন দেখা গেল হিগিনকাকু এসেই ভণ্টুর মাকে খুব খটোমটো বাংলায় বলতে লাগলেন, "এই যে ভদ্রে ভ্রাতৃবধূঠাকুরানী, কয়েক পাত্র কৃষ্ণকায় কফি হবে তো ? দুগ্ধহীন, শর্করাবর্জিত কফি ? অধিকন্তু—" কিন্তু কথা শেষ করার আগেই ভণ্টুর মা বলে উঠলেন, "ওরে বাপ রে বাপ রে বাপ, বন্ধ করো ঠাকুরপো, বন্ধ করো। আমি সমোস্কৃত একদম বুঝি না। না কি আজকাল তুমি যাত্রার পার্ট ধরেছ ?"

হিগিনকাকু মনমরা হয়ে বললেন, "বলছি খাঁটি বঙ্গভাষা, বলে কিনা 'সমোস্কৃত' ! আর কথাটা 'সমোস্কৃত' নয়, 'সংস্কৃত'। যাই হোক, কেন এ ভাষা বলছি জানো ? আজ থেকে আমরা যুক্তব্যঞ্জনের আলোচনা শুরু করব।"

ততক্ষণে বসবার ঘরে সবাই আসর জমিয়ে বসেছেন। রান্নাঘরে কেটলির জলের শোঁ-শোঁ আওয়াজ উঠেছে, কাল এনে রাখা প্যাটিজও বোধহয় গরম করা হচ্ছে—তার মধ্যে ভণ্টুর বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "যুক্তব্যঞ্জন দিয়ে আবার কী হবে ? তার উচ্চারণে আবার কোনো সমস্যা আছে নাকি ? পর-পর দুটো ব্যঞ্জন উচ্চারণ হলেই তো যুক্তব্যঞ্জন, তাই না ?"

"আরে দাদা, অত সোজা নাকি জিনিসটা ? প্রচুর সমস্যা আছে। কিন্তু আগে দুটো জিনিস আলাদা করে খেয়াল করো। লেখার যুক্তাক্ষর বা যুক্তব্যঞ্জন একদিকে, আর কথার পরপর বা পাশাপাশি ব্যঞ্জন আরেকদিকে। যেমন ধরো 'আস্ত' কথাটার 'স্ত' যুক্তাক্ষর বা যুক্তব্যঞ্জন, কিন্তু 'আসত' কথাটার 'সত' পাশাপাশি ব্যঞ্জন মাত্র। অথচ ইস্কুলে বর্ণভাগ করতে দিলে দুটোই হবে (আ+স্+ত্+ও)। তাই তো ?"

ভণ্টু শেষে 'অ' না হয়ে কেন 'ও' হচ্ছে বুঝে নিয়ে, মাথা ঝাঁকাল। বাবা বললেন, "ঠিক আছে, কিন্তু তাতে কী হল ?"

হিগিনকাকু গলা চড়িয়ে বললেন, "আমি বলতে চাই, 'পাশাপাশি' ব্যঞ্জনের দুটোই পরপর পরিষ্কার উচ্চারণ হয়, কিন্তু লেখার যুক্তব্যঞ্জনের দুটোই সবসময় উচ্চারণ নাও হতে পারে। যেমন 'কদমা'-তে 'দ্' 'ম' দুটোই শুনি আমরা, কিন্তু 'পদ্ম'-তে ? সেটা তো আমাদের মুখে 'পদ্দোঁ'। তার ম-খানা গেল কই ?"

বাবা ভণ্টু দুজনের হাতই মাথায় উঠল। চুলকোবার জন্যে। (ক্রমশ)

ডাক্তারখানায়

প্রসাদ

যদিও ডাক্তার সময় দিয়েছেন বিকেল পাঁচটা, বাবা সাড়ে তিনটে থেকেই তাড়া লাগাতে আরম্ভ করলেন। চম্বল বুঝতে পারে না, এত তাড়াহুড়োর কী আছে। আধ ঘণ্টার রাস্তা, সাড়ে চারটেয় বেরোলেই যথেষ্ট। কিন্তু বাবার সব কাজেই ভীষণ ব্যস্ত ভাব।

"We'd better start early," he has been saying, "the traffic jams are getting worse every day. It may take us hours to get there."

"Yes," Mummy agreed, it's better to start with plenty of time in hand."

ফলে, ঘণ্টাখানেক সময় বাকি থাকতেই চম্বল বাবার সঙ্গে চোখের ডাক্তারের ডাক্তারখানায় পৌঁছে গেল।

The waiting-hall was filled with patients and their escorts. Mr. Roy and Chambal found seats with some difficulty.

As soon as he was seated Chambal started looking round. There was nobody of his age. There were magazines lying on the table. He picked one up and started turning its pages.

"I've no difficulty in reading even the small print. Why do I need glasses then? But the doctor who came to our school said to me, 'you'd better see an eye-specialist.' Why?"

Then Chambal looked at the man sitting next to him. He was also looking at a magazine. But, Chambal noticed, he was not hold-

ing it as close to his eyes as Chambal was.

Chambal thought, "I can read pretty well now, but may be I'll read better with glasses."

He remembered what Daddy said when he heard about the doctor's advice.

"You'd better do as the doctor has advised. I'll ring up Dr. Nandi today and make an appointment."

Chambal didn't have to wait very long. Dr. Nandi made a thorough examination of his eyes and prescribed glasses.

As Chambal was leaving with his father, the Doctor said to him, "I put something in your eyes. You'd better not try to do any reading tonight."

এবারে লক্ষ করো, এই শব্দ দুটির ব্যবহার

Had better

কিছু করা উচিত, কিংবা করলে ভাল হয় বোঝাতে শব্দ দুটি ব্যবহার করা হয়। লক্ষ করো, ক্রিয়াপদটির রূপ এক্ষেত্রে অতীতকালেরই হয়, যদিও অতীতের কথা নয়, ভবিষ্যতের কথাই বলা হচ্ছে।

We'd (We had) better leave early.

You'd (You had) better see a doctor.

You'd better do as the doctor has advised.

You'd better not try.

ছবি এঁকেছে **দেবরাজ পাল** (বয়স ১০)

ছবি এঁকেছে **সৌমিক দাস** (বয়স ১০)

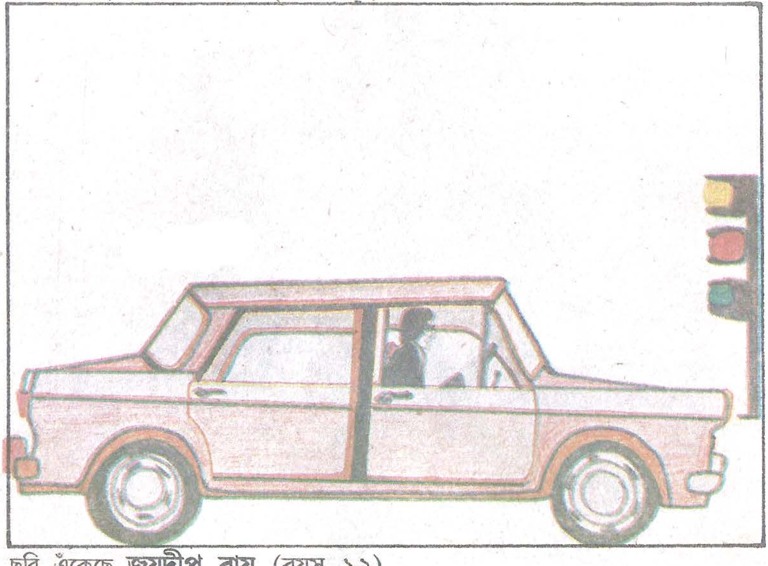

ছবি এঁকেছে **জয়দীপ রায়** (বয়স ১২)

আমি কে ?

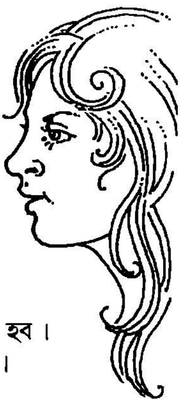

আমি একটি মেয়ে
কিন্তু আমি কে ?
কোথায় ছিলাম ?
কোথায় এলাম ?
কোথায় যাব ?
সেখানে কী খাব ?
বলতে পারো ?
লিখতে পারো ?
আমি তাহলে খুশি হব।
আমি একটি মেয়ে।
কিন্তু আমি কে ?

তিলোত্তমা বসু (বয়স ১২)

বংশীদাস ডাক্তার

বংশীদাস ডাক্তার
খুব নাম ডাক তার
চোখের চশমা নাকে সেঁটে
রোগী দেখেন পায়ে হেঁটে
ভিজিটটা তার সামান্য
সবাই তাই করে মান্য
অহঙ্কার কিছু নেই
উদ্যম সবেতেই
যত বড় হোক রোগ
স্টেথিস্কোপ বাগিয়ে
বুকেতে ধরেন যেই
রোগ যায় পালিয়ে

পূর্ণিমা দে (বয়স ৭)

ছবি এঁকেছে **তন্ময় সামন্ত** (বয়স ১০)

গাছের শক্তি

কিছুদিন আগে আমাদের বাগানের দেয়ালের গায়ে ছোট্ট একটা অশ্বত্থ গাছের চারা দেখেছিলাম। সবাই বলে, অশ্বত্থ গাছ নাকি কাটতে নেই। তাই কেউ আর গাছটা কাটেনি।

কিছুদিন পরে দেখি গাছটা বেশ বড় হয়ে গেছে! গাছের ছোট-ছোট ডালে সবুজ পাতা। কিন্তু দেয়ালের গায়ে ছোট-বড় অনেক ফাটল দেখা দিয়েছে। ওইটুকু একটা গাছ অত মোটা দেয়ালে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে। ব্যাপারটা দেখে আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম। গাছের শেকড়ের সঙ্গে মাটির কোনো যোগই নেই! কিন্তু গাছটা তার সব শক্তি নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে ওই দেয়াল থেকে রস টেনে। ভাবলে অবাক লাগে, এই গাছটার কী অসীম শক্তি!

ওই দেয়ালটায় ধাক্কা দিয়ে আমি একটুও নাড়াতে পারিনি, এতটুকু গাছ কী করে তাতে ফাটল ধরাল! আমি জানি, গাছটা একদিন অনেক বড় একটা গাছ হয়ে উঠবে। তাই সব সময় লক্ষ রাখি কেউ যেন ওই গাছটা ছিঁড়ে নষ্ট না করে ফেলে। ওর শেকড়গুলো কিছুদিন পরেই মাটির কাছে পৌঁছে যাবে। তখন তোমাদের সকলকে আমি সে খবর জানিয়ে দেব।

ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ৯)

আমার প্রিয় দিন

পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে আমরা ঠিক করলাম বনভোজন করব। আমি ও আমার পাড়ার বন্ধুরা। রাখি, মৌরি, টিংকু, সোমা, শ্রাবন্তী, মিঠু, পিয়ালি, দীপান্বিতা ও আমি।

আমাদের পাড়ার পুবদিকে একটি সরু খাল আছে। তার ধারে আমাদের বনভোজন হবে। বনভোজনের দিন ঠিক করা হল।

ভাত, কপির তরকারি, ডাল ও আলুভাজা খাওয়া হবে। প্রত্যেকের চাঁদা পড়েছে চার টাকা করে। ভোরবেলা উঠে সব-কিছু নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। যথাস্থানে পৌঁছে গেলাম তাড়াতাড়ি। চার বন্ধু রান্নার ভার নিল। বাকি আমরা গল্প ও গান করলাম।

আটটার সময় ডিম, কলা ও পাউরুটি খেলাম। তারপর খাল থেকে স্নান করে বুড়িবসন্ত খেললাম। তারপর দুপুরের খাবার—ভাত, কপি, ডাল ও আলুভাজা খেলাম। আবার সবাই মিলে ব্যাডমিণ্টন খেললাম। বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। ছুটির দিনের মধ্যে এই দিনটি ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় দিন। এই দিনটির কথা আমি জীবনে ভুলতে পারব না।

উজ্জয়িনী বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ৯)

বাঘা

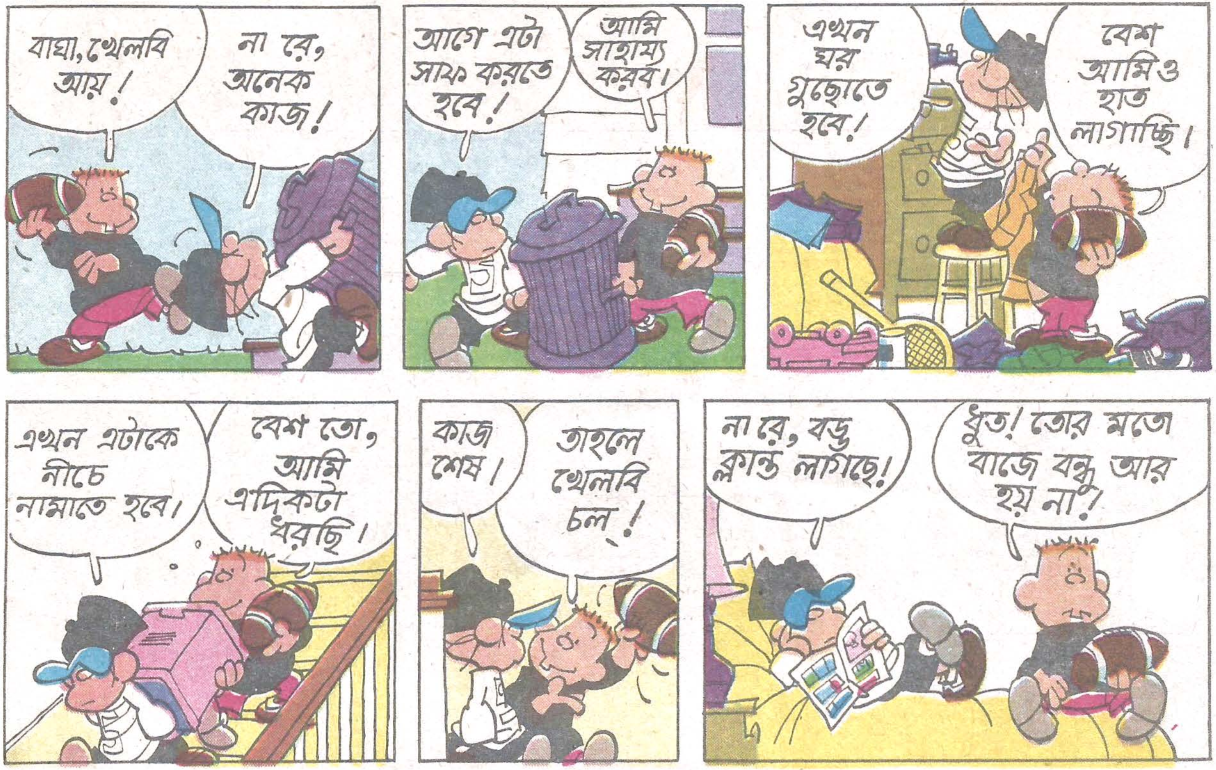
বাঘা, খেলবি আয়!
না রে, অনেক কাজ!
আগে এটা সাফ করতে হবে!
আমি সাহায্য করব।
এখন ঘর গুছোতে হবে!
বেশ আমিও হাত লাগাচ্ছি।
এখন এটাকে নীচে নামাতে হবে।
বেশ তো, আমি এদিকটা ধরছি।
কাজ শেষ।
তাহলে খেলবি চল!
না রে, বড্ড ক্লান্ত লাগছে!
ধুত! তোর মতো বাজে বন্ধু আর হয় না!

শুধুমাত্র দুধ থেকে শক্ত আহারের দিকে পরিবর্তন আপনার বাচ্চার পক্ষে সহজতর করে তুলুন…

নেস্টাম: সহজতর পরিবর্তনের উপযোগী করে বিশেষভাবে তৈরী বেবী সিরিয়াল।

আপনার শিশুর জন্যে সবসেরা জিনিষটিই আপনার চাই। সেই জন্যেই আপনি তাকে বুকের দুধ খাওয়ান—যা সবচেয়ে বেশী পুষ্টিকর ও সহজে হজম হয়।

যখন তার বয়স প্রায় চারমাস তখন তার শক্ত আহারেরও প্রয়োজন। কিন্তু তার হজমশক্তি তখনও অত্যন্ত কোমল। তখন তার প্রয়োজন এমন একটি সিরিয়াল যা সে সহজে হজম করে। যেমন, নেস্টাম।

প্রথম শক্ত আহার হিসেবে নেস্টাম আদর্শ কারণ তা চাল থেকে তৈরী। পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের অভিমত যে অন্যান্য যে কোনও সিরিয়াল থেকে নেস্টাম-ই হল সহজ পাচ্য।

দুধের সঙ্গে প্রস্তুত করলে, নেস্টাম পুষ্টির দিক থেকে সম্পূর্ণ খাদ্যে পরিণত হয় আর এতে থাকে অতি প্রয়োজনীয় সবরকম পুষ্টিকর পদার্থ। শিশুর ত্বককে উজ্জ্বল ক'রে তুলতে, তার দৃষ্টিশক্তিকে সচ্ছ ক'রে আনতে এবং তার রোগ প্রতিরোধের সহজাত ক্ষমতা বাড়াতে এতে রয়েছে সেইসব ভিটামিন। নেস্টামে যে আয়রণ আছে, তাতে রক্ত বিশুদ্ধ রাখে, এর ক্যালসিয়ামে করে হাড় ও দাঁত শক্ত।

দুধের সঙ্গে নেস্টামের ব্যবহার বহুমুখী। তা'ছাড়া সেদ্ধ ফল, রান্না করা ও চটকানো তরকারী এবং ডালের সঙ্গেও নেস্টাম দেওয়া চলে।

বিনামূল্যে!

আপনার শিশু তার খাবারে বৈচিত্র্য পছন্দ করে। অতএব বিনামূল্যে নেস্টাম রেসিপি ফোল্ডারের জন্যে লিখুন:

নেস্টাম
পোষ্ট বক্স নং 6016 নিউ দিল্লী 110 008

SAA/FSL/N/3150 BEN

তৈরী করা খুব সোজা।

আগে ফোটানো কুসুম-গরম দুধ ঢালুন। | নেস্টাম মিশিয়ে নিন। | এবার খেতে দিন।

NESTLÉ.

আয়রণ ও ভিটামিনে সমৃদ্ধ

নেস্টাম

বেবি সিরিয়্যাল

দুধের সঙ্গে মেশান

Regd. No. WBCC 264 MH-By-SOUTH-683

everest/84/PP/26-bn